ভিখারীর আত্মকাহিনী

প্রথম খন্ড

রচনাকাল : ৮ শ্রাবন ১৩৮১ - ১৯ ভাদ্র ১৩৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরপূর্বাভাস ও জন্ম

(১১৫৮ - ১৩০৭)

শহর বরিশালের প্রায় ছয় মাইল উঃ পূঃ দিকে কীর্তন খোলা নদীর পশ্চিম তীরে "চর বাড়ীয়া লামচরি" গ্রামটি অবস্থিত। সাধারণ্যে ইহা "লামচরি" নামে পরিচিত। গ্রামটির বয়স দেড়শত বছরের বেশী নয়। গ্রামটি ছিল খুবই নীচু, সাইরের অধিকাংশ সময়ই থাকত জলমগ্ন। তাই এর নামকরণ হয়- "লামচরি" অর্থাৎ নীচু চর। এ গ্রামে লোকের বসবাস শুরু হয় মাত্র ১১৬২ সাল হতে। নবাগত বাসীন্দারা সমস্তই ছিলেন কৃষক। এই নবাগতদের মধ্যে একজন মধ্যবিত্ত কৃষক ছিলেন আমাদ উল্লাহ্ মাতুব্বর এবং তাঁর তৃতীয় পুত্র এন্তাজ আলী মাতুব্বর আমার পিতা। মা বলেছেন আমার জন্ম ১৩০৭ সালের ৩রা পৌষ।

AMARBOI.COM

চরম দুর্দিন

লামচরি মৌজাটি ছিল লাখুটিয়ার রায়বাবুদের জমিদারীর অধীন। আমার চার বছর বয়সের সময় অর্থাৎ ১৩১১ সালে আমার পিতা পরলোকগমন করিলে ১৩১২-১৩১৫ সাল পর্যন্ত বাকি খাজানায় নালিশ করে ১৩১৭ সালে রায়বাবুরা আমার ভূসম্পত্তিটুকু নীলাম-খরিদ করে নেন এবং কর্জ-দেনার দায়ে বসত ঘরখানা নীলাম করে নেন বরিশালের কুখ্যাত কুসীদ জীবি জনার্দন সেন ১৩১৫ সালে। বিত্ত ও গৃহহীনা হয়ে অতিকষ্টে বিধবা মাতা রবেজান বিবি আমাকে প্রতিপালন করতে থাকেন।

লামচরির মক্তব

১৩৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এখানে কোন রাস্তা হাট-বাজার, দোকান-পাট বা কোনরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে মস্‌জিদ ছিল কয়েক খানা। বাসীন্দারা প্রায় সমস্তই মুসলমান।

আমাদের গ্রামে নিয়মিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলেও -মুর্দা জানাজা, ফাতেহা ও মৌলুদ পাঠ, বিবাহের কলেমা, তালাক পড়ানো ইত্যাদি কাজের জন্য কেহ কেহ বাড়ীতে মুন্সি ধরনের বিদেশী আলেম রাখতেন। তাঁরা সকাল-বিকেল কর্তার ছেলে-মেয়েদের বাংলা ও আরবী পড়াতেন বা মুখেমুখে-কলেমা, ছুরা-কেরাত ও নামাজ শিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ পাড়া প্রতিবেশীর ছেলে মেয়েদেরও পড়াতেন। এ জন্য কাউকে নিয়মিত বেতন দিতে হত না। কেননা তাঁরা ওপরী যা পেতেন, তাতেই তাঁদের চলত। বিবাহ-তালাকটা কচিৎ শহরে হলেও শরীয়তের অন্যান্য কাজগুলোতে ছিল তাঁদের একচেটিয়া অধিকার, অধিকন্তু কলেরা, বসন্তাদি মহামারীতে বেশী সংখ্যক লোক মারা গেলে ত কথাই ছিল না।

মুন্সি তাহের আলী

দক্ষিণ লামচরি নিবাসী কাজেম আলী সরদার সা'হেব - মুন্সি তাহের আলী নামক ঐ রকম একজন মুন্সি রেখে ১৩১৯ সালে তাঁর বাড়ীতে একখানা মক্তব খোলেন এবং গ্রামের লোকদের ছেলে-মেয়েগণকে সেখানে পড়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান, আমার মাকেও। মক্তবের বেতন ও পুস্তকাদি কিনে দিতে মা অপারগ বলে জানালে সরদার সা'ব বল্লেন যে, তিনি আমার বেতন নিবেন না এবং এ বছর বই পুস্তকও আবশ্যক হবে না। কেননা এ বছর তালপাতা ও কলা পাতায়ই হবে। সিদ্ধ তালপাতা ও খাগের কলম নিয়ে মক্তবে যেতে শুরু করলাম।

প্রথম দিনে মুন্সি সা'ব একটা ছুঁচালো লোহা দ্বারা তালপাতায়ে স্বর ও ব্যাঞ্জন বর্ণ এঁকে দিলেন এবং পড়া বলে দিতে লাগলেন। আমি অন্যান্য ছেলেদের সাথে পড়তে শুরু করলাম। স্বর ও ব্যাঞ্জন বর্ণ পড়তে-লেখতে বছর খানেক কেটে গেল।

মুন্সী তাহের আলী সা'ব ছিলেন মূলাদীর বাসীন্দা। মক্তব বন্ধ দিয়ে একদা তিনি দেশে গেলেন, আর ফিরলেন না। পরে শোনা গেল যে, তিনি মারা গেছেন। মক্তবটি বন্ধই রইল।

মুন্সি আবদুল করিম

১৩২০ সালে স্থানীয় মুন্সি আবদুল করিম সা'ব তাঁর শশুর আবদুল মল্লিকের বাড়ীতে আর একখানা মক্তব খোলেন এবং পাড়ার লোকদের কাছে ছাত্র ভর্তির আমন্ত্রন জানান। ছাত্রদের মাথাপিছু বেতন ধার্য করলেন চার আনা।

পাড়ার অনেক ছেলে মক্তবে যেতে শুরু করল। কিন্তু আমার যাওয়া হল না, কেননা মা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেতন দিতে পারবেন না। একদা মুন্সি সা'ব আমাদের বাড়ীতে এসে মাকে বল্লেন যে, আমাকে তাঁর মক্তবে পড়তে দিলে তিনি আমার বেতন নিবেন না এবং পারেনত কিছু সাহায্য করবেন। মা রাজী হলেন এবং আমি মক্তবে যেতে শুরু করলাম।

এ হলো আমার শিক্ষা-জীবনের দ্বিতীয় বছর। 'বানান' ও "ফলা" লেখা শুরু হলো কলা পাতায়ে। লেখতে হত- বাঁশের টুনীর কলম (খাগ জুঠত না বলে) এবং মেটে দোয়াতে- লেখের কালি, চাল পোড়াবাটা ভৃঙ্গুরাজের পাতার রসে তৈরী কালির দ্বারা। পয়সা এতে খরচ হত না মোটেই। কিন্তু এর পর মুন্সি সা'ব বল্লেন যে, আমাকে একখানা "আদর্শ লিপি" বই ও এক খানা শ্লেট কিনতে হবে। বাড়ীতে গিয়ে মাকে উহা জানালে তিনি বল্লেন- "পয়সা কই"?

মক্তবের সকল ছেলেই তাল ও কলা পাতায় পড়া-লেখা করত না, অনেকেরই 'আদর্শ লিপি' বই ও শ্লেট-পেন্সিল ছিল, ছিল না মাত্র আমার মত কয়েকটি গরীব ছেলের। মক্তবে আমার অল্প কয়েক দিনের পড়া লেখার ফল ভাল দেখে আমার জ্ঞাতি চাচা মরহুম মহব্বত আলী মাতুব্বর সা'ব দু আনা পয়সা দিয়ে আমাকে একখানা 'আদর্শ লিপি' (সীতানাথ বসাক কৃত) বই কিনে দিলেন এবং জ্ঞাতি ভ্রাতা মরহুম হামজে আলী মাতুব্বর দিলেন তাঁর একখানা ভাঙ্গা শ্লেটের আধখানা। পেন্সিল বানালাম মেটে পাত্র-ভাঙ্গা চাড়া কেটে। কোন রকম পড়া ও লেখা চলতে লাগল।

(১) এর পর মুন্সি সা'ব ফরমায়েস দিলেন যে, একখানা "বাল্য শিক্ষা" বই কিনতে হবে। মাকে উহা জানালে তিনি আগের মতই উত্তর দেন "পয়সা কই ?"

এতদিন পর মূল্যটা ঠিক স্মরণ নাই তবে -রামসুন্দর বসু প্রণীত একখানা "বাল্য শিক্ষা" ও একখানা "ধারাপাত" বই কিনে দিলেন আমাকে আমার ভগ্নিপতি মরহুম আঃ হামিদ মোল্লা এবং মুন্সি সা'ব স্বয়ং সংগ্রহ করে দিলেন আরবী কায়দা সম্বলিত একখানা "আমপারা"। এ সময় আমি পড়তে লাগলাম "বাল্য শিক্ষা" বই ও "আমপারা" এবং লেখতে লাগলাম "শতকিয়া -কড়াকিয়া" আর কষতে লাগলাম "যোগ-বিয়োগাদি (অমিশ্র) অঙ্ক"।

(২) এটা হলো আমার শিক্ষা-জীবনের তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৩২১ সাল। আমাদের গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই ছিলেন বিত্তবান। কিন্তু শিক্ষার প্রতি ছিলেন উদাসীন। তাই কেউই রীতিমত মুন্সি সা'বকে ছাত্র বেতন দিতেন না। মুন্সি সা'বও ঘরের খেয়ে পরের গেয়ে সময় নষ্ট না করে মক্তবটি বন্ধ করে দিলেন। আর এখানেই হলো-"বাল্য শিক্ষা" বই পড়ে আমার বাল্য-শিক্ষার সমাপ্তি বা সমাধি।

ছবি ও জলের কল (১৩২২)

মক্তবটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সকালে-বিকেলে দীর্ঘ লাফ ও দুপুরে-খালের জলে ডুব-সাঁতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি খেলা-ধুলা নিত্যকার কাজ হয়ে দাঁড়াল এ পাড়ার সব ছেলেদের এবং আমারও। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আরও দুটি কাজের প্রবণতা ছিল আমার। যাহা অন্য কোন ছেলের ছিল না। সে কাজ দুটি হলো–ছবি আঁকা ও জলের কল তৈরী করা

কেন, জানি না, আমি ছবি ভাল বাসতাম। "বাল্য শিক্ষা" ও অন্যান্য বইয়ের পাতা উল্টিয়ে আমি উহা বার বার দেখতাম এবং ওগুলি নিজ হাতে আঁকিবার নিষ্ফল চেষ্টা করতাম।

এ সময় (১৩২২ সাল) বরিশালে "জলের কল" স্থাপিত হ'তেছিল। বরিশালে যাতায়াতের পথে আমি উহা মনোযোগের সহিত দেখতাম ও দেখে আনন্দ পেতাম এবং বাড়ীতে এসে কৃত্রিম "জলের কল" তৈয়ার করতাম।

মুন্সি আহাম্মদ দেওয়ান (১৩২৩)

১৩২৩ সালে আমার জ্ঞাতি চাচা মহব্বত আলী মাতুব্বর সা'ব আহাম্মদ আলী দেওয়ান নামক ভাসান চর নিবাসী এক জন মুন্সি রেখে তাঁর বাড়ীতে একটি মক্তব খোলেন। আমি ঐ মক্তবে ভর্তি হলাম। এখানে আমার পাঠ্য ছিল "মক্তব প্রাইমারি" নামক একখানা বই এবং গণিতে করণীয় ছিল মিশ্র চার নিয়মের অঙ্ক। কিন্তু আমার পাঠ্য পুস্তক খানার মাত্র "আট পৃষ্ঠা" পড়া এবং "মিশ্র যোগ" অঙ্ক কয়েকটি কষা হলে মক্তব বন্ধ করে দেওয়ান সা'ব দেশে গিয়ে আর ফিরে এলেন না। কিছুদিন পর খবর পাওয়া গেল যে, তিনি ইহধামে নেই। মক্তবটি উঠে গেল।

আমাদের পাড়ায় তখন ঘুড়ী উড়াবার প্রচলন ছিল খুব বেশী। মায়ের কাছে নগদ পয়সা চেয়ে পাবার আশা ছিল না। তাই ঘর হতে কিছু চাল চুরি করে বিক্রি দিয়ে, সেই পয়সা দ্বারা "চীন কাগজ" কিনে ঘুঁড়ী তৈরী করে তা পাড়ার ছেলেদের কাছে বিক্রি দিতে লাগলাম এবং এতে বেশ কিছু মুনাফা হতে লাগল। এর দ্বারা আমি কয়েকখানা "চিত্রাঙ্কন" শিক্ষার বই ও কাগজ কিনে নানাবিধ ছবি এঁকে একেঁ দিন কটাতে লাগলাম। আমার মা ছিলেন অত্যন্ত নামাজী মানুষ। তিনি আমার এ সব আনাড়ী কাজ আদৌ পছন্দ করতেন না, পাড়ার লোকেও না। সবাই মাকে বলত-ছবি দেখা, রাখা, আঁকা, এ সবই হারাম। এ সব গোনাহ্‌র কাজে ছেলেকে আস্কারা দেবেন না, ছেলেটি আপনার "গোষ্ঠীছাড়া"। মা আপসোস করে বলতেন-"আল্লাহ্ ! তুমি সকলেরে দেলা পূত আর আমারে দেলা ভূত"।

পলায়ন (১৩২৪)

১৩২৩ সালে আমার ভগ্নিপতি আঃ হামিদ মোল্লা আমার সেঝ ভগ্নীকে নেকাহ্ করে এসেছেন আমাদের সংসারে। তিনি এসে আমার নীলামী সম্পত্তিটুকু জমিদারের কাছ থেকে পুনঃ পত্তন গ্রহণ করলেন। কিন্তু জমির অর্ধেক কবুলিয়ত দিয়ে নিলেন তিনি তাঁর মাতা মেহের জান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবির বেনামীতে এবং অর্ধেক দিলেন আমাকে (নাবালক বিধায় আমি কবুলিয়ত দিতে না পারায়) আমার মাতার বেনামীতে। এ সময় তিনি আমাদের একান্ন ভূক্ত থেকে কৃষিকাজ করতেছিলেন। আমি তাঁর মাঠের কাজে সহায়তা না করে বেয়ারাপনা ও আনাড়ী কাজ করায় তিনি ছিলেন আমার উপর অত্যন্ত রুষ্ঠ ।

১৩২৪ সালের ৩রা চৈত্র। মোল্লা সা'ব দুপুরে হাল ছেড়ে মাঠ হতে এসে দেখতে পেলেন যে, আমি পুকুরের পাড়ে বসে "জলের কল" চালাচ্ছি। তখন ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি আমাকে কয়েকটি কিল-চড় মেরে হাত ধরে একটি আছাড় দিলেন এবং বহু পরিশ্রমের তৈরী "জলের কল" ভেঙ্গে চুরে ফেলে ঘরে চলে গেলেন। আমি কিছু সময় কান্না করে ঘরে যেয়ে দেখি যে, মা ভাত পাক করছেন আর মোল্লা সাব-আমার বহু দিনের পুঁজী করা ছবি ও বই গুলি জ্বলন্ত চুলোয় দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। উহা দেখে ক্ষোভে-দুঃখে আমি আবার কাঁদতে লাগলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম-আমি আর ছবিও আকঁব না, জলের কলও বানাব না, "হয়ত পড়ব, নয়ত মরব"।

বেলা ১২টা। একখানা ছেড়া লুঙ্গী পরে ও একটি ময়লা জামায় পকেটে চৌদ্দ আনা পয়সা গুঁজে অভুক্ত লুকিয়ে ঘর হতে বের হলাম পশ্চিম দিকে। বেলা দুটোয় বরিশাল পুঁছে কিছু খেয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে চলতে লাগলাম পশ্চিমে। কলেজ রোডে এক ভদ্রলোকের সহগামী হলাম। চল্‌তে চল্‌তে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন-আমার বাড়ী কোথায়, কেন কোথায় যাব ইত্যাদি। আমি আমার ঠিকানা বল্লাম আর বল্লাম যে, কোথায় যাব, তা জানি না, তবে উদ্দেশ্য আমার লেখা-পড়া শিক্ষা করা। আমার বক্তব্য শুনে ভদ্রলোকটি আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বল্লেন। আমি রাজী হয়ে তাঁর সাথে সাথে চল্লাম।

ভদ্রলোকটির নাম এখন স্মরণ নাই, তাঁর ঠিকানা-বরিশাল থেকে সতর মাইল পশ্চিমে "বাকপুর" গ্রামে প্রসিদ্ধ কাজীবাড়ী। পিতার নাম মহব্বত আলী কাজী। রাত বারোটায় আমরা কাজীবাড়ী পুঁছলাম। আহারান্তে ভদ্রলোকটি আমাকে বল্লেন যে, ওখান থেকে তিন মাইল পশ্চিমে বানরীপাড়া থানা। সেখানে থেকে (বেলা ১০টায়) স্টিমার যোগে সরুপকাঠী যাওয়া যায় এবং ওখান হতে সামান্য উত্তর দিকে "মাগুরা" গ্রামে মৌলুভী নেছার উদ্দিন সা'বের বাড়ী। আমি সেখানে গেলে হয়ত পড়বার সুযোগ পেতে পারি (সে সময়ের লোকে-"সর্ষীণা"কে "মাগুরা" এবং "পীর সা'বকে" শুধু 'মওলানা সাব' বলত) সংকল্প ঠিক করে শুয়ে পরলাম।

৪ঠা চৈত্র। ভোরে আহারান্তে ভদ্রলোকটির কথিত পথ ধরে বেলা ১১টায় আমি মৌলুভী সা'বের বাড়তে পুঁছলাম এবং দেখতে পেলাম যে, কয়েক জন ছাত্র ছোট একটি পানা ভর্তি পুকুরে পানা পরিষ্কার করছে আর মওলানা সা'ব পাড়ে বসে তা দেখছেন, দু-তিন জন লোক তাঁর কাছে দাঁড়ানো। আমি ছালাম বলে দাঁড়াতেই মওলানা সা'ব জিজ্ঞেস করলেন আমার নাম, ধাম ও ওখানে যাবার কারণ কি। আমি সবিনয়ে সকল কথা বল্লাম। শুনে তিনি আমাকে বল্লেন-"তুমি মাষ্টার সা'বের কাছে যাও, মাদ্রাসায় ভর্তি হও গিয়ে"। শুনে আমি আনন্দে যেন স্বর্গের দ্বারে পুঁছলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজ নিয়ে মাষ্টার এমদাদ আলী সা'বের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বল্লাম যে, মওলানা সা'ব আমাকে তাঁর মাদ্রাসায় ভর্তি হতে বলেছেন, আপনি দয়া করে ভর্তি করে নিন। শুনে মাষ্টার সা'ব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন-"তোমার অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে এসেছ ?" বল্লাম "হাঁ"। আবার জিজ্ঞেস করলেন-"অনুমতি পত্র এনেছ ?" বল্লাম "না"। তিনি আমাকে বল্লেন -"বাড়ীতে অনুমতির জন্য চিঠি দাও, উত্তর পেলে ভর্তি করব"। আমার কাছে পয়সা নাই" বলে জানালে তিনি আমাকে দুখানা পয়সা দিয়ে বল্লেন-"এর দ্বারা পোস্টকার্ড কিনে বাড়ীতে চিঠি দাও"।

আমি মহা ফাঁপরে পড়ে মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, বাড়ীতে চিঠি দিলে মা আমাকে কিছুতেই বিদেশে থাকবার ও পড়বার অনুমতি দেবেন না, বরং আমার খোঁজ পেয়ে মোল্লা সা'বকে পাঠিয়ে আমাকে ধরে নিবেন, হয়ত মারধোরও করতে পারে। অধিকন্তু মাষ্টার সা'বের নিকট আমি "মিথ্যাবাদী" প্রমাণিত হব। এর চেয়ে এখন স্বেচ্ছায় আমার বাড়ীতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

আমি মাষ্টার সা'বের কাছ থেকে চলে এলাম। মাষ্টার এমদাদ আলী সা'ব যেন আমাকে স্বর্গের দ্বার হতে ফিরিয়ে দিলেন মর্ত্তে।

দেখলাম-মওলানা সা'বের বাড়ীতে একটি লঙ্গরখানা (দাতব্য হোটেল) আছে। মাদ্রাসার শিক্ষক, বিদেশী ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য বহুলোক ওখানে খেয়ে থাকে। আমি দুপুরে ওখানে খেলাম এবং রাত্রেও। জানতে পারলাম যে, লঙ্গরখানার বাবুর্চি সা'ব ছুটি নিয়ে আজ শেষ রাতে নৌকো যোগে বাড়ীতে যাবেন। বাড়ী তাঁর ঝালকাঠীর নিকটবর্তি "গাবখান" গ্রামে। আমি ঝালকাঠী যাবার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ জানালে তিনি রাজী হলেন এবং যথা সময়ে আমাকে ডেকে নিলেন। আমি মাগুরা ত্যাগ করলাম।

৫ই চৈত্র। বেলা ১০টায় আমরা গাবখান পুঁছলাম। আমার পথের সম্বল ১৪ আনা পয়সা - বরিশালের হোটেল ও (বানরীপাড়া -সরূপকাঠী) স্টিমারেই খরচ হয়েছিল। এখন পকেটে আছে মাত্র মাষ্টার সা'বের দেওয়া দুটি পয়সা। পয়সা দুটি বাবুর্চি সা'বের হাতে দিলাম আর বল্লাম-"এ পয়সা দু'টি মাষ্টার সা'বের হাতে দেবেন"। নৌকো হতে উঠে আমি ঝালকাঠীর পথ ধরলাম।

যখন ঝালকাঠী পুঁছলাম, তখন বেলা ১১টা। বেশ ক্ষুধা পাচ্ছিল। কিন্তু ওখানে বসে থাকলেত ক্ষুধা মিটবে না! ভেবে স্থির করলাম যে, আজ সারাদিন না খেয়েই আমাকে চলতে হবে- চৈত্র মাসের দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে (উনিশ মাইল পথ ঝালকাঠী-বরিশাল ১৩ ও বরিশাল লামচরি ৬ মাইল) বরিশালের রাস্তা ধরে হাটতে শুরু করলাম।

ক্রমে রোদের তাপ ও ক্ষুধা উভয়ই বাড়তে লাগল। কিন্তু কমতে লাগল-শক্তি ও সহ্য। সামান্য হাটি আবার ছায়া পেলে বসি। এ ভাবে হেটে-বসে বেলা দুটোয় পাড়ি দিতে হল পেমারের বিশাল মাঠ। প্রায় ঘন্টাখানেক অবিশ্রাম চলতে হ'ল। কেননা এখানে কোন গাছপালা নাই। ক্ষুধা-পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বিশেষতঃ রোদে। মাঠ পার হয়ে এক গেরস্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ীর দরজায় বসে বিশ্রাম নিলাম ও চেয়ে কিছু চাল-পানি খেয়ে আবার হাটতে শুরু করলাম। যখন বাড়ীতে পুঁছলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা।

আমি ভেবেছিলাম যে, বাড়ীতে এসে আমার মায়ের তিরস্কার ও মোল্লা সা'বের অত্যাচার ভোগ করতেই হবে। কিন্তু তা কিছুই হ'ল না। আমাকে দেখে মা'র আনন্দ আর ধরে না। তিনি আনন্দে কাঁদতে লাগলেন, কাছে টেনে নিয়ে আমার বুকে-পিঠে হাত বুলালেন, তাড়াতাড়ি খেতে দিলেন। শোনলাম - আমি বাড়ী হতে যাবার পর মা আর আহার করেন নাই। সব সময় কেঁদেছেন আর আমার "জলের কল" ভাঙ্গা ও "বই-ছবি" পোড়ার জন্য মোল্লা সা'বকে আবোল-তাবোল বলেছেন আর বকেছেন–তুমি আমার সব সম্পত্তি খাবার মতলবে "কুডী" কে মেরে ঘরের বের করেছ। ওটা মারা গেলেই তোমার ভাল। ওকে তালাশ করে এনে দাও ইত্যাদি (ছোটবেলা মা আমাকে "কুডী" বলে ডাকতেন এবং অন্যরাও)।

মা'র কোন কথার উত্তর না দিয়ে মোল্লা সা'ব সেদিন পাড়ার আত্মীয়-কুটুম্বদের বাড়ীতে এবং বরিশাল জাহাজ ঘাট গিয়ে বিদেশগামী জাহাজ সমূহে আমাকে খোঁজ করেছেন। পরের দিন দূরাঞ্চলের আত্মীয়-কুটুম্বদের বাড়ীতে খোঁজ করে কোথায়ও না পেয়ে "নিরুদ্দেশ" সংবাদ পুলিশে জানাতে আজ থানায় গিয়েছেন।

মোল্লা সা'ব রাত ৮টায় বাড়ীতে এসে আমাকে দেখতে পেয়ে খুশী হলেন কি-না, জানি না; তবে নিশ্চিন্ত হলেন। পরের দিন আবার তিনি থানায় গেলেন (বরিশাল) আমার "পৌঁছার" সংবাদ পুলিশে জানাবার জন্য। রাত্রে তিনি বাড়ীতে এসে বল্লেন যে, সে পুলিশের "কনেষ্টবল" পদে ভর্তি হয়ে এসেছেন। আসছে বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে তিনি ট্রেনিং এ যাবেন। যথা সময়ে মোল্লা সা'ব ছয়মাস ট্রেনিং এর জন্য ঢাকায় গেলেন। আমি শ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। (বৈশাখ ১৩২৫)

ভাবতে লাগলাম-এখন কি করব। প্রতিজ্ঞা করেছি-"হয়ত পড়ব নয়ত মরব"। প্রতিজ্ঞা বহাল রাখতে হলে আমাকে পড়তে হবে, নচেৎ মরতে হবে। কিন্তু কোথায়ও পড়বার সুযোগ পাচ্ছি না বলে কি মরব? মরা ত সোজা কথা নয়। কেমন করে মরব? আত্মহত্যা? ইচ্ছা-মৃত্যু চেষ্টা সাপেক্ষ। স্বেচ্ছায় মরতে হলে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। মরার জন্য যেমন চেষ্টা আবশ্যক, তেমন পড়ার জন্যও। তবে কোন্‌টা আগে করব? স্থির করলাম যে, আগে পড়বার জন্য চেষ্টা করব, বিফল হলে পরে মরবার চেষ্টা।

এখন সমস্যা হল- কোথায় পড়ব? কা'র কাছে পড়ব? কি পড়ব? ইত্যাদি। সমাধান করলাম–আমি কোথায়ও পড়ব না, কারও নিকট পড়ব না, একটা কিছু পড়ব না। আমি ঘরে বসে পড়ব, একা একা পড়ব, সব কিছু পড়ব; অর্থাৎ যা-ই-পাব, তা-ই-পড়ব।

মুন্সি আপছার উদ্দিন *(১৩২৫)*

দক্ষিণ লামচরি নিবাসী পূর্বোক্ত কাজেম আলী সরদার সা'ব (তাঁর জামাতা) মুন্সি আপছার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দিন নামক এক জন আলেম এনে তাঁর বাড়ীতে পুনঃ মক্তব খোল্লেন। মুন্সি সা'ব বাংলা ভাষা ভাল জানতেন না, তবে আরবী, ফারসী ও উর্দুতে ছিলেন সুপণ্ডিত এবং সুফিও। তাঁর মত নিষ্ঠাবান নিষ্কাম সাধু পুরুষ আলেম সমাজে অল্পই আছেন। আমি তার মক্তবে ভর্তি হলাম না, তবে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গিয়ে আরবী ও উর্দু পড়তে শুরু করলাম (১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগ হতে) এবং পড়লাম–পবিত্র কোরান, রাহে নাজাত ও মেফ্ তাহুল জান্নাত নামক দুখানা কেতাব। নামাজাদি দীনিয়াতের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমূহ তাঁর কাছেই শিক্ষা করলাম।

আমার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল পিতার মৃত্যুর পর হতেই। কিন্তু উহা চরমে পুঁছেছিল ১৩১৭ সালে, বিত্ত নীলামের পর। রায় বাবুরা আমার চাষের জমিটুকু সবই নীলামে খরিদ করে দখলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভিটি-বাড়ীটুকু দখল করে নিচ্ছিলেন না। আর আমাদের সম্বলও ছিল উহাই। ওর মধ্যে বেড়-পুকুর ও ঘরভিটি বাদ গিয়ে . . . কাঠার বেশী জমি ছিল না। ওতে কয়েকটি ফলবান নারিকেল ও সুপারী গাছ ছিল, যার ফল বিক্রি করা যেত। এ ছাড়া বাড়ীতে মা - লাউ, কুমড়া, চিচিঙ্গা ইত্যাদি তরিতরকারী খরিচ রোপন করে ও সব বিক্রি করে কিছু পয়সা পেতেন। এতদ্ভিন্ন মাও ধাত্রী কাজে কিছু পেতেন। এছাড়া হাঁস-মোরগ পালন ছিল আর একটি আয়ের পথ। আর এর দ্বারা নির্বাহ করতে হ'ত দুটি প্রাণীর বারো মাসের খোরাক, পোষাক ও অন্যান্য খরচ পত্র।

আত্মীয় কুটুম্বরা কেহ কোনরূপ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন নি। দেখেছি অভাব গ্রস্থ ব্যক্তির নিকট হতে –

"আত্মীয় কুটুম্ব সব দূরে সরে যায় কেননা নিকটে পেলে যদি কিছু চায়?" কিন্তু আমাদের তুচ্ছ করে সরে যায়নি মাত্র দু'জন, তারা হ'ল - "উপবাস" ও "ছিন্নবাস"।

বই ও পুথি প্রাপ্তি

আমাকে পড়া-লেখা শেখায়ে মানুষ করবার আন্তরিক ইচ্ছা মা'র ছিল, কিন্তু তাঁর সামর্থেও কুলোয়নি।

আমার মনে বড় রকমের একটা আফসোস ছিল এই যে, তখনো আমি বাংলাভাষা স্বচ্ছন্দে পড়তে পারতাম না, অনেক শব্দই বর্ণবিন্যাস করে পড়তে হ'ত। এতে যে কোন একটি বাক্য অবিরাম না পড়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়বার ফলে ওর অর্থ দুর্বোধ্য হ'ত। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দে পড়বার জন্য।

বই কেনার সম্বল নেই বলে এপাড়া ওপাড়ার ছেলেদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলাম, পড়তে লাগলাম - পথে পড়ে থাকা টুকরো কাগজ কুড়িয়ে, এমন কি লবণ বাঁধা ঠোঙ্গার কাগজও। কোন রূপ লেখা থাকলেই তা হ'ত আমার পাঠ্য। ওতে কি লেখা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন্ বিষয় লেখা, উহা পাঠে কোন জ্ঞানলাভ হ'ল কি-না ইত্যাদি প্রশ্ন ছিল আমার অনাবশ্যক। তখনকার আমার পড়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধু - স্বচ্ছন্দে পড়বার ক্ষমতা অর্জন করা।

এ সময় বই ছিল আমার নিত্য সহচর। ঘরে বসে পড়তাম, শুয়ে পড়তাম, খাবার সময় পাশে বই মেলে রেখে খেতাম ও পড়তাম। কোথায়ও ভ্রমনে বের হ'লে সঙ্গে বই নিয়ে যেতাম এবং কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেও কোনও না কোন বই সঙ্গে নিয়ে যেতাম আর সুযোগ মত পড়তাম। অনেক সময় "স্বচ্ছন্দে বই পড়ছি", ইহা স্বপ্নে দেখতাম।

একদিন আমাদের ঘরের মাচানের ওপর কাপড়ে বাঁধা একটা কাগজের বস্তা দেখতে পেলাম। ওটা-কবে, কোথা থেকে কে এনেছে- তা জানি না; তবে ওখানে রেখেছেন মোল্লা সা'ব। বস্তাটি নামিয়ে খুলে দেখতে পেলাম যে, ওর ভেতর আছে - কতগুলো বই, পুথি ও হাতের লেখা খাতা। বই গুলোর মধ্যে আছে - একখানা "গণিত পাঠ" একখানা "ভূগোল শিক্ষা প্রণালী", একখানা "ভারত বর্ষের ইতিহাস", একখানা "সরল বাংলা ব্যাকরণ" ও একখানা গল্পগ্রন্থ "গোপাল ভাঁড়"। পুথি গুলোর মধ্যে আছে সোনাভান, জঙ্গনামা, মোক্তল হোসেন, আছরাজ্জালাত, গাজী কালু, রসনেছা মালু খাঁ ইত্যাদি এবং খাতাগুলোর মধ্যে আছে- কতগুলো তন্ত্র-মন্ত্র ও তাবীজ-কবজের নমুনা। বই-পুথি গুলো পেয়ে তখন আমি যে আনন্দ লাভ করেছিলাম, তা আজও ফুরোয় নি। ওগুলোর জন্যে মোল্লা সা'বকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব আজীবন। তখন মনে মনে ভাবলাম যে, পেটের খোরাক পাই আর না পাই মনের খোরাক পেলাম বহুদিনের। আপাততঃ আমার বই-পুস্তকের অভাব দূর হ'ল, এখন অপেক্ষা শুধু পড়বার। দেখা যা'ক।

AMARBOI.COM

পাঠ্য সহচর

আমাদের গ্রামের মক্তব গুলোতে শিক্ষার বিভাগ ছিল মাত্র দুটি - সাহিত্য ও অঙ্ক। এছাড়া শিক্ষার অন্যান্য বিভাগগুলো আমার ছিল অজানা। ভূগোল, ইতিহাস ও ব্যাকরণ এ নামগুলো সবে মাত্র জানলাম।

সদ্য প্রাপ্ত বই-পুথি গুলো নাড়া চাড়া করে দেখলাম এবং ধীরে ধীরে কিছু পড়লাম। পুথিগুলো নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করলাম না। কারণ আমার প্রতিবেশী আঃ রহিম ফরাজী ছিলেন ভাল একজন পুথি পাঠক। ভাবলাম যে, পুথি গুলো তাঁকে দিয়া পড়াব ও তাঁর সঙ্গে পড়বার চেষ্টা করব। বইগুলো পড়ে - গল্প ও ইতিহাস কিছু বোঝতে পারলাম, ভূগোল বোঝলাম যৎসামান্য কিন্তু ব্যাকরণ "না" বল্লেই চলে। ব্যাকরণ বাদ রেখে আমি - গল্প, ইতিহাস ও ভূগোল পড়তে লাগলাম। আমার পড়ার কোন রুটিন ছিল না; সকাল-বিকাল, সন্ধ্যা-দুপুরও ছিল না; ছিল - যখন যা ইচ্ছা, তখন তা পড়া। শুধুই পড়া।

বার বার বই গুলো পড়ে একটা ফল পেতে লাগলাম। দেখা গেল যে, যে কোনও বই পড়ে প্রথম বার যা বোধগম্য হচ্ছিল, দ্বিতীয় বারে হচ্ছে তার চেয়ে বেশী, তৃতীয়বারে তার চেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশী এবং চতুর্থ বারে আরো বেশী। শেষমেশ প্রায় বারো-চৌদ্দ আনাই হয়ে ওঠে বোধ্য, অবোধ্য থাকে মাত্র দু-চার আনা; তা শব্দার্থ জানার অভাবে। পড়া চালাতে লাগলাম। ভাবলাম - থা'ক না কিছু অবোধ্য, যেটুকু বুঝি সেটুকুই লাভ।

ভূগোলে

এ সময় আমি আর ছবি অঙ্কন করি না। কিন্তু অঙ্কনের প্রবণতা ছাড়াতে পারিনি। এরই ফলে ভূগোল পড়তে গিয়ে মানচিত্র আঁকতে শুরু করে দিলাম। এ সময় একটা ঘটনা আমার মানচিত্র অঙ্কনের সুযোগ এনে দিল। ঘটনাটি এই-একদা রাত্রে পড়বার সময় আমার হাত থেকে "কুপী" বাতিটা বইয়ের উপর পড়ে গিয়ে কেরাসিন পড়ে বইয়ের কাগজ ভিজে গেল। এতে করে ভিজা কাগজের অপর পৃষ্ঠা বা তার নীচেকার কাগজের লেখাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম যে, কটু তেল বা নারিকেল তেলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। আমি নারিকেল তেল মাখানো কাগজ (শুকিয়ে) মানচিত্রের উপর রেখে নকল মানচিত্র আঁকতে শুরু করলাম।

কিছু দিন ভূগোল পাঠের সাথে সাথে মানচিত্র অঙ্কন করে আমি বোঝতে পারলাম যে, ভৌগলিক বিবরণ পড়ার সাথে সাথে মানচিত্র দেখার চেয়ে (মানচিত্র) অঙ্কনের গুরুত্ব বেশী। যেহেতু মানচিত্র - দর্শনের চেয়ে অঙ্কনে স্মৃতিপটে দাগ কাটে ভাল। আর কোন দেশ, প্রদেশ, শহর-বন্দর ইত্যাদি "স্থান" এর অবস্থান সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারনা না থাকলে ভূগোলের শুধু বিবরণ পড়ার কোন মূল্য থাকে না।

AMARBOI.COM

আমার অঙ্কিত মানচিত্রে কোন দেশ, প্রদেশ বা মহাদেশের সমস্ত শহর বন্দর চিহ্নিত করতাম না, করতাম প্রধান ও প্রসিদ্ধ গুলি। কেননা মূল মানচিত্রের সকল লেখা এক সময়ে নকল করতে গেলে আমার মানচিত্র হয়ে যেত একটা হিজি-বিজি ও মসিময়। বিশেষতঃ চিহ্নিত "স্থান" এর সংখ্যাধিক্যের দরুন উহা পঠনে ঘটত বিস্মৃতি। মানচিত্র আঁকবার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তেলা কাগজের ব্যবহার ত্যাগ করলাম। কিন্তু ওর দ্বারা আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তার সুফল ভোগ করছি আজও (জরিপ কাজে)।

গণিত শিক্ষা

"গণিত পাঠ" বইখানা ধরে কয়েকদিন পাতা উল্টালাম। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারলাম না। কেননা বইখানা ছিল তখনকার "ছাত্রবৃত্তি" (ষষ্ঠ শ্রেণী) পড়ার পাঠ্য। আমার পক্ষে উহা ছিল সমুদ্র বিশেষ। সাঁতার দিলাম।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বইখানায়ে অঙ্কের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার প্রথমদিকে উহা কষবার "নিয়ম" ও "উদাহরণ" দেয়া ছিল। আমি ধারাবাহিকভাবে নিবিষ্ট চিত্তে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার "নিয়ম" পড়ে ও 'উদাহরণ" অনুসরণ করে অঙ্ক কষতে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণিত খানার "নিয়ম" ও "উদাহরণ" গুলো পেয়ে আমার শিক্ষকের আবশ্যকতা কমে গেল। কিন্তু বেড়ে গেল চিন্তার বহর। আবার সংসারের (বাড়ীর) নানা রূপ কর্ম-কোলাহল ও হৈ-হল্লাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে একনিষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা করাও অসম্ভব। তাই আমি অঙ্ক কষতে আরম্ভ করলাম গভীর রাতে, যখন থাকত না আমার নিবিষ্ট-চিন্তা-ভঙ্গকারী কোন শব্দ। মিশ্রামিশ্র চার নিয়ম হ'তে শুরু করে ভগ্নাংশ, দশমিক, সমানুপাত, ত্রৈরাশিক, বর্গ ও ঘন ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্ক ক'ষে বইখানা শেষ করতে আমার প্রায় দুবছর কেটে গেল।

আরবী শিক্ষায় উদ্যোগ (১৩২৬)

১৩২৬ সাল। এখন আমার বয়স প্রায় উনিশ বছর। পিতার মৃত্যুর পর দীর্ঘ পনরটি বছর বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মা আমাকে প্রতিপালন করছেন আর আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছেন ও বলছেন - "আমার কুড়ী বড় হ'লে এক দিন সুখ হবে"। এখন আমি কিছুটা বড় হয়েছি। কিন্তু আমার দ্বারা মা'র কোন দুঃখ-কষ্ট লাঘব হচ্ছে না। এখনও আমাদের উভয়ের ভাত-কাপড়ের চিন্তা মা-কেই করতে হচ্ছে। তবে আমি বড় হলাম কেন? কিন্তু এখন আমিই বা কি করতে পারি বা করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

বলছিলাম যে, আমাদের নীলামী জমিটুকু পুনঃ গণ্ডন আনা হয়েছে। কিন্তু তা নামে মাত্র। রায় বাবুদের দাবীর টাকা পরিশোধ করতে হয়েছিল সব জমিটুকু বন্ধক রেখে। এতে জমিতে আমাদের স্বত্ব এসেছিল কিন্তু দখল আসেনি।

মোল্লা সা'ব এ সময় বাউফল থানার পুলিশ। চাকুরীতে বেশ উপার্জন করেন। তিনি টাকা দিয়ে আমাদের বন্ধকী জমিটুকু ছাড়ালেন। মা আমাকে বল্লেন- "মোল্লার পোয় চাকরী করে, তুই হালুটি কর। দুই জনে খাটলে আমাগো আর অভাব থাকবে না"। আমি সম্মত হলাম।

মোল্লা সা'ব পনর টাকা মূল্যে একটি হালের গরু কিনে দিলেন এবং প্রতিবেশী "এক গরুওয়ালা" একজন কৃষকের সহিত আমি ভাগে হাল-চাষ শুরু করলাম (কার্তিক-১৩২৬)। প্রথম ফসল জন্মালাম- খেসারী, মশুরী, কিছু মরিচ ও তিল ইত্যাদি। কৃষি কাজ চালাতে লাগলাম।

এ সময় পর্যন্ত মাচানে প্রাপ্ত বস্তাটির বইগুলো পড়া আমার প্রায় শেষ হচ্ছিল (ব্যাকরণ বাদে)। এখন আমি প্রতিবেশী আঃ রহিম ফরাজীর নিকট গিয়ে পুথি পড়তে শুরু করলাম, অবশ্য রাত্রে। ফরাজী সা'ব সুর করে পুথি পড়তেন এবং আমি তাঁর সাথে সাথে সুর মিলিয়ে কখনো বা একা একা পড়তাম। এরূপ বিভিন্ন পুথি পড়ে নানা রূপ কেচ্ছা-কাহিনী জ্ঞাত হয়ে আনন্দ পেতে লাগলাম। বিশেষতঃ এতে আমার (ভাষা) শিক্ষার অগ্রগতি হতে লাগল। অধিকন্তু - ছবি আঁকার মত আর একটা নেশায় আমাকে পেয়ে বসল। তা হ'ল - পুথির "পয়ার" ও "ত্রিপদী" জাতীয় ছন্দের অনুকরণে নূতন কিছু রচনা করা। চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের গ্রামে তখন "পুথিগান" এর প্রচলন ছিল যথেষ্ট। "পুথিপড়া" হতে "পুথিগান" ভিন্ন। ওকে "সায়েরগান" ও বলে। সায়েরগান অনেকটা কবি গানের অনুরূপ। এতে একজন বয়াতী ও দু-তিন জন দ্বোহার থাকে। পুথিগত কোন কেচ্ছা-কাহিনী কিংবা দেখা বা শোনা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বয়াতী গান রচনা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে গানের মজলিসের কোন আশু ঘটনার প্রেক্ষিতে যখন তখন গান রচিত হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি গানের দুটি অংশ থাকে "ধুয়া ও লহর"। "লহর" অংশটা বয়াতী একাই গেয়ে যায় আর "ধুয়া" অংশটা দ্বোহার গণ পুনরোক্তি করে। গানের "ধুয়া" অংশটা যারা পুনরোক্তি করে অর্থাৎ দ্বোহরায়, তাদের "দ্বোহার" বলা হয় এবং গান বা কবিতাদি অর্থাৎ "বয়াত" রচনাকারীকে বলা হয় "বয়াতী"।

আমাদের পাড়ায় ঐ রকম একজন পুথিগানের বয়াতী ছিলেন মেছের আলী সিকদার। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশ সৈন্য দলে চাকুরী নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন বসরায়। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ বন্ধ হলে ১৯১৯ (বাং ১৩২৬) সালে অবসর প্রাপ্ত হয়ে তিনি বাড়ীতে এলেন এবং গ্রামের বিভিন্ন স্থানে আসর জমিয়ে পুথিগান গাইতে লাগলেন। যুবা-বৃদ্ধ সকলেই গান শোনতে যেতেন, আমিও যেতাম। প্রথম কয়েকদিন গেলাম গানের শ্রোতা হিসেবে, পরে দ্বোহার হিসাবে।

সিকদার সা'ব যে সকল গান গাইতেন, আমি তার অনুকরণে গান রচনার চেষ্টা করতে লাগলাম এবং কয়েকটি গান রচনা করলাম। সিকদার সা'বের গানের একজন দ্বোহার ছিলেন আমার প্রতিবেশী আঃ রহিম ফকীর। আমার রচিত গান ক'টি তাঁকে দেখালাম এবং ধীরে ধীরে গেয়ে শোনালাম। শুনে তিনি বল্লেন- "হয়েছে ভাল, এগুলো আসরে গাওয়া চলে"। আমি আরো গান রচনা করতে লাগলাম।

১৩২৭ সালে আমি বয়াতী হয়ে পুথিগানের দল গঠন করলাম। আমার দ্বোহার হলেন জাহান আলী, হোসেন মল্লিক ও আঃ রহিম খাঁ। ওঁরা সকলেই আমাদের গ্রামের পশ্চিম পাড়ার নিবাসী। দিন দিন গানের উৎকর্ষ হতে লাগল।

পুথিগান, প্রতিযোগিতা মূলক গান। এতে একাধিক বয়াতী না হ'লে গান ভাল জমে না। শ্রোতাগণ বিচার করেন যে, প্রতিযোগীদের মধ্যে কোন্ বয়াতীর-গলার স্বর, গানের সুর ও ছন্দঃ ভাল; কে অপেক্ষাকৃত অধিক তার্কিক, বাকপটু, শাস্ত্রজ্ঞ ইত্যাদি।

দেশী ও বিদেশী অনেক বয়াতীর সহিত আমার পাল্লার (প্রতিযোগিতার) গান হ'তে লাগল। এতে দেখা গেল যে, সব সময় তর্কযুদ্ধে জয়ী হ'তে হ'লে যে পরিমাণ শাস্ত্রজ্ঞান থাকা আবশ্যক, তা আমার নাই। কাজেই আমার আরো বেশী পরিমাণ পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা আবশ্যক। সেজন্য সচেষ্ট হলাম।

এ সময় আমাদের সংসারের কর্তৃত্ব মা'র হাতে নেই, আমার হাতে। মোল্লা সা'ব এসময় আমাদের পরিবারভুক্ত। তাই তিনি যে টাকা-পয়সা রোজগার করেন, তা আমার কাছে দেন এবং আমি উহা আবশ্যকীয় কাজে খরচ করি। হাতে নগদ পয়সা পেয়ে কিছু অযথা খরচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে লাগলাম, যা'কে "সংসার খরচ" বলা চলে না। আলেপ-লায়লা, কাছাছোল আম্বিয়া, ফকির বিলাস, হযরতল ফেকা, তালে নামা, ছায়ত নামা ইত্যাদি কতগুলো পুথি এবং রামায়ন মহাভারত, মনসা মঙ্গল, গীতা, রাধাকৃষ্ণ বিলাস ইত্যাদি কতগুলো হিন্দু-শাস্ত্র কিনলাম ও ওগুলো পড়তে লাগলাম।

রায় বাবুদের লামচরি তহশীল কাছাড়ীতে নীল কান্ত মুখার্জী নামক একজন মোহরার ছিলেন, নিবাস পান বাড়ীয়া। তিনি ছিলেন হিন্দুশাস্ত্রে সুপন্ডিত। বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা ভাল জানতেন। তাঁর সাথে আলাপ-ব্যবহারে তিনি আমার বেশ বন্ধু হয়ে গেলেন। আমি তাঁর কাছে হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু জানার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তিনি আমাকে কয়েক খানা বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থ দান করেন এবং ঋক বেদের কিছু অংশ বঙ্গানুবাদ করে দেন। "মনু সংহিতা" নামক বৈদিক গ্রন্থখানা দান করেন আমাকে চর মোনাই নিবাসী বাবু যামিনী কান্ত বিশ্বাস।

এ সময় আমি দিন ভর মাঠে কাজ করতাম আর রাত্রে - হয়ত কোথায়ও আসরে গান নচেৎ ঘরে বসে পুস্তকাদি অধ্যয়ন করতাম। সময়ের অপচয় করতাম না মোটেই। কৃষি ও গান, উভয়ের উন্নতি হতে লাগল। যে কোন বিষয় বা ঘটনা, দেখা বা শোনা মাত্র সে সম্বন্ধে তৎক্ষনাৎ গান রচনা করার ক্ষমতা আমার এ সময় অর্জিত হয়েছে।

মোল্লা সা'ব আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হলেন এবং তাঁর দোস্ত (বন্ধু) ময়জদ্দিন গোলদারের একমাত্র কন্যা লালমন বিবির সহিত আমার বিবাহ স্থির করলেন। ১৩২৭ সালের ২২শে ফাল্গুন সরাজারী এবং ১৩২৯ সালের ২৯শে কার্তিক আমার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

বিগত ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাস হ'তে আমি নিয়মিত ভাবে সংসারের "জমা" ও "খরচ" এর হিসাব লিখে রাখতে শুরু করি। কেননা তৎপূর্বে আমার হাতে সংসারের কর্তৃত্ব ছিল না। মোল্লা সা'ব ট্রেনিং পাশ করে (ঐ সালে) কার্তিক মাসে বরিশাল এসে বাউফল থানায় বদলী হ'ন এবং অগ্রহায়ণ মাস হ'তে সংসারের বাজার খরচ বাবদ আমার হাতে কিছু কিছু টাকা দিতে থাকেন। তিনি কখন, কত টাকা দিলেন এবং তা কিসে কত খরচ করলাম তা মোল্লা সা'বকে বুঝায়ে দেওয়াই ছিল তখন জমা-খরচ লেখার উদ্দেশ্য। মোল্লা সা'ব সময় সময় হিসাব দেখতেন এবং বই পুথি কেনায় খরচ দেখলে অসন্তুষ্ট হতেন। এ জন্য এ যাবত আমি আমার আশানুরূপ পুস্তাকাদি কিনতে কুণ্ঠা বোধ করছি। বই-পুথি কেনা ও পড়া, এ দুটোই আমার যেন একটা নেশা। এ সময় আমার বই কেনার অসুবিধাটা দূর হল। কেননা এ সময় আমি পুথি গানে বেশ টাকা পেতে লাগলাম এবং তা সমস্তই খরচ করতে লাগলাম বই-পুথি কেনায়।

চিকিৎসা শিক্ষা (১৩৩০)

১৩৩১ সাল। আমার জ্ঞাতি (চাচাত) ভ্রাতা আঃ রহিম (রহম আলী) মৃধা বেড়াতে যাবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর বেহাই (মৃধা সা'বের পুত্র ফজলুর রহমানের শ্বশুর) এমদাদ উল্লা কাজীর বাড়ীতে (কালীগঞ্জ)। মৃধা সা'ব ছিলেন- ধনে, মানে, জ্ঞানে, গুণে, এ অঞ্চলের সেরা ব্যক্তি। তিনি তাঁর অনান্য কুটুম্ব ও সব জ্ঞাতি ভাইদের দাওয়াত করলেন এবং আমাকেও। অধিকন্তু আমাকে আমার গানের দোহারগণকে নিয়ে যেতে বল্লেন। তিনি যাবেন সেখানে "পয়নামা" নিয়ে খুব ধুমধামের সহিত, সেখানে আমাকে গান করতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে আমরা কাজী বাড়ী গেলাম এবং সবাই বৈঠকখানা ঘরে বসলাম। ঘরের মধ্যভাগটা -গের্দা, বালিশ তাকিয়া ইত্যাদি নানা উপকরনে সাজানো। মৃধা সা'ব ও আমার অন্যান্য জ্ঞাতি ভাইয়েরা ওখানেই বসলেন। কিন্তু আমাকে বসতে দেওয়া হ'ল বারান্দায়। কারণ-আমি "বয়াতী"। গান করলাম। বাড়ীওয়ালা পুরস্কার দিলেন দশ টাকা। কথায় বলে "যাক জান, থাক মান"। অর্থাৎ মানহানীর চেয়ে প্রাণহানী ভাল। আত্ম মর্যাদায় আঘাত পেয়ে সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম-বেঁচে থাকতে আর কখনো গান করব না, চেষ্টা করে দেখব কোনো দিন মৃধা সা'বের পাশে বসতে পারি কি-না। (চেষ্টায় সফলতা লাভ করেছিলাম তখন, যখন-১৩৩৯ সালে চর বাড়ীয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথম পদে নির্বাচিত হলাম এবং ১৩৪৩ সালের নির্বাচনেও উভয়ে পুনঃ উহার "সদস্য" পদে নির্বাচিত হলাম। অধিকন্তু আমি হলাম নির্বাচিত "সহ সভাপতি" মৃধা সা'ব নন। এতদ্ভিন্ন -আমি তাঁর সামনেই সরকার কতৃক মনোনিত হয়েছিলাম ১৩৪৬ সালে স্থানীয় ডি, এস বোর্ডের "সদস্য" এবং ১৩৪৮ সালে চর বাড়ীয়া ইউনিয়ন জুট কমিটির "সহ সভাপতি")।

AMARBOI.COM

জীবন প্রবাহের গতি (১৩৩১)

বরিশাল চকের পোলের পূর্ব পাশে ঢাকা নিবাসী মুন্সি আলীমুদ্দিন সা'বের একখানা পুস্তকের দোকান ছিল। তিনি তাঁর দোকানে- কোরান শরীফ, কেতাব ও পুথিই রাখতেন বেশী; কিছু বাংলা বইও রাখতেন। আমি ওখানে যাতায়াত করে মুন্সি সা'বের সাথে ভাব জমালাম এবং সুযোগ মত ওখানে গিয়ে বই-পুথি পড়তে লাগলাম। একদা মুন্সি সা'ব আমাকে "রবিন্‌শন ক্রুশো" নামক এক খানা বই দিলেন, আমি ওখান কিনে আনলাম। নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল রবিনশন বহু বছর যাবত দ্বীপবাসী থেকে কিভাবে বেঁচে থাকছিলেন, সে কাহিনী পড়ে আমার এক নুতন মানসিকতার সৃষ্টি হল। আমি ওতে দেখলাম-"মানুষের অসাধ্য কাজ নাই, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, সাহসে শক্তি যোগায়" ইত্যাদি বহু প্রবাদ বচনের প্রত্যক্ষ উদাহরণ "রবিন্‌শন"। আমার কর্মজীবনকে একান্তই প্রভাবিত করেছে "রবিন্‌শন ক্রুশো", দিয়েছে আমাকে স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা। ওটা আমার স্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে।

আমার জীবন প্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সম্ভবতঃ চার জন লোকের দ্বারা। তাঁরা হচ্ছেন (১) মাষ্টার এমদাদ আলী, (২) মোল্লা আঃ হামিদ (৩) মুন্সি আলী মুদ্দিন এবং অধ্যাপক (৪) কাজী গোলাম কাদির-সা'ব। এর যে কোনো একজন লোকের অভাবে আমার জীবনের গতি হয়ত অন্য দিকে চলে যেত (১) মাষ্টার এমদাদ আলী সা'ব আমার উপকার-না-অপকার করেছে, জানি না, তবে তিনি আমার "ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্কল্পে বাধাদান" করে আমার জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাহকে বিপরীত মুখী করেছেন, বের করে দিয়েছেন আমাকে আলেম সমাজ হ'তে। (২) আমাকে আধুনিক শিক্ষার পথ প্রদর্শন ও শিক্ষা লোভী করেছেন মোল্লা সা'বের"বইয়ের বস্তাটি"। ওটা না পেলে আমি জ্ঞান রাজ্যের পথের সন্ধান পেতাম না, হয়ত চলে যেতাম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের রাজ্যে, হয়ে পড়তাম কু-সংস্কারের বেড়া জালে আবদ্ধ। (৩) মুন্সি আলী মুদ্দিন সা'বের প্রদত্ত "রবিন্‌শন ক্রুশো" বই খানা দিয়েছে আমাকে স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা, অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে, উচুঁ-নীচুঁ সর্বস্তরের সকল কাজ স্বহস্তে করবার উদ্দীপনা। ও বইটাই আমার যাবতীয় "চেষ্টা" ও সাহস এর উৎসওটা না পেলে হয়ত আমি হয়ে যেতাম- অলস, অক্ষম ও পরাধীন, অর্থাৎ অন্যের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলী।

১৩২৩ সালে মায়ের বাসা ঘরটি ভেঙ্গে মোল্লা সা'ব সেখানে (১০ X ৫ হাত) এক খানা কুঁড়ে ঘর তুলেছিলেন।

ছুতার কাজ শিক্ষা (১৩৩১)

এ যাবত আমরা ওতেই বসবাস করছি। কিন্তু এখন আর ওতে চলছে না। বিগত ৩/৯/২৯ (বাং) তারিখে স্থানীয় আয়শা বিবির নিকট হ'তে কিছু জমি কিনেছি এবং বাড়ীর পূবদিকে চর পড়িয়া কিছু জমি বৃদ্ধি হয়েছে। এতে কৃষি কাজের কিছু উন্নতি হচ্ছে ও পশার বাড়ছে। ধান, চাল, পাট, তিল, মরিচ ইত্যাদি বাড়ী ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বর্তমান কুঁড়ে ঘরখানা এখন অনুপযোগী। ভাবলাম ছোটখাট একখানা টিনের ঘর তুলব। কিন্তু ছুতার লাগাব না, কাজ সব করব নিজে।

আমাদের ঘরে বহুবছর যাবত একটি হাতুরী ও একটি বাটালী ছিল। ওদুটো সংগ্রহ করছিলেন মোল্লা সা'ব। আমি বরাবরই ওর দ্বারা কাঠকুটো কাটাকুটি করতাম। গৃহ নির্মাণের জন্য আরো যে সব হাতিয়ার আবশ্যক, তা চাইলাম প্রতিবেশী আঃ কাদির আকনের কাছে, তিনি দিতে সম্মত হলেন। আকন সা'ব ছিলেন একজন সুনিপুণ ছুতার মিস্ত্রী, তবে পেশাদার নহেন।

একদা চর মোনাই নিবাসী কাজেম আলী হাওলাদারের একখানা ঘর দেখে আমার খুব ভাল লাগছিল। তখন ভাবছিলাম যে, কখনো পারলে এই রকম একখানা ঘর তুলব। সেখানে গিয়ে সেই ঘরখানার একটা নক্‌সা এঁকে ও তার বিভিন্ন অংশের মাপ ঝোক লেখে আনলাম।

বরিশাল হ'তে কিনে আনলাম- শাল কাঠের খাম ও বাইন কাঠের আড়া, পাইর, রুয়া, চেড়া ইত্যাদি এবং টিন তক্তাদি ঘরের আবশ্যকীয় কাঠ সংগ্রহ করছিলাম একটা খরিদা কড়ই গাছ চিড়িয়ে।

১৩৩১ সালের ১১ই কার্তিক, আমাদের পুরান খড়ের ঘরখানা ভেঙ্গে (১৩ X ১০ হাত) নুতন ঘরের খাম পুতলাম এবং যথা নিয়মে কাজ করতে লাগলাম। খাম পুতিয়ে আড়া-পাইর লাগিয়ে, চাল বানিয়ে ছাউনী দিতে প্রায় মাস দেড়েক কেটে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫শে অগ্রহায়ণ নতুন ঘর সঞ্চার করলাম (নতুন বেড়া বাকি)। অতঃপর মাঠের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ত্রিকাঠ, চৌকাঠ, বেড়া, কবাট, জানালা ইত্যাদি তৈরী করতে বছর খানেক কেটে গেল এবং গৃহ সরঞ্জাম যথা- খাট, চেয়ার, টেবিল, বাক্স, আলমারী ইত্যাদি তৈরী করতে সময় লাগল আরো বছর খানেক। অতঃপর আমার যখন যেটুকু ছুতারের কাজ আবশ্যক হতে থাকল, তখন তা নিজেই করতে লাগলাম।

(১৩৩৪ সালে মোল্লা সা'ব আমাকে -করাত, বুরুম, রেঁদা, সারাশী, ভ্যানা, মার্তুল, কুরুল ইত্যাদি ছুতার কাজের যাবতীয় যন্ত্রপাতি কিনে দিলেন এবং ওর বিনিময়ে আমি তাঁর এক খানা (১৩ X ১০ হাত) নুতন টিনের ঘর তুলে দিলাম (মোল্লা সা'ব আমার সংসার হ'তে ১৩৩২ সালের ১০ই আষাঢ় ভিন্ন হচ্ছিলেন।)

এ সময় হতে ছুতার কাজের যন্ত্রপাতি সমূহ হল আমার নিজস্ব। তাই পরবর্তি জীবনের যাবতীয় গৃহ ও গৃহসরঞ্জামাদি নিজেই তৈরী করেছি ও করছি, এমন কি লাঙ্গল-জোঁয়াল এবং নৌকাও। আমার সংসার জীবনে কখনো কোন কাজ "জানিনে" বলে অন্যের শরণাপন্ন হইনি। অথচ অর্থ-উপার্জনের জন্য কখনো অন্যের কোন কাজ করিনি। আমার ছুতার কাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল-অর্থোপার্জন বা অর্থ বাঁচানো নয়, স্বাবলম্বী হওয়া। ফলতঃ যে কোন ধরনের কাজ - "করতে জানা" এবং তা "নিজ হাতে করা", এ দুটোতেই আমার মনের আনন্দ। রশি পাকানো, শিশি-বোতলের গলে "যোত" লাগানো এমন কি ঝাঁটা নির্মাণকেও আমি গৌরবের কাজ মনে করি।

AMARBOI.COM

জরীপ কাজ শিক্ষা (১৩৩৩)

১৩৩৩ সাল। একদা মোল্লা সা'ব এক বান্ডিল কাগজ আমার হাতে দিয়ে বল্লেন- "এইগুলি সারিয়া রাখিও"। ওর ভেতর ছিল- বন্দকী জমি ছাড়ানো কয়েকখানা ছেঁড়া দলিল, লামচরি মৌজার সি,এস ম্যাপ, পর্চা, দাখিলা, রশিদ ইত্যাদি ভূসম্পত্তি বিষয়ক কাগজপত্র। ওগুলো পড়ে দেখলাম, সব বোঝলাম না। তবে ম্যাপখানা নিয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম উহা ভালভাবে বোঝবার জন্য। কেননা আমার ভৌগলিক মানচিত্রগুলো আঁকবার ও দেখবার উৎসাহটা গড়ায়ে পড়ল এটার ওপর। ম্যাপখানা ছিল- ২০২৯ নং মৌজা চর বাড়ীয়া লামচরির ২ নং সিট। স্কেল ১৬"= ১ মাইল। এটাতে আমাদের বাড়ী, বাগান, পুকুরাদি ও নাল জমি অঙ্কিত আছে এবং খাল-নদীও। আমার পিতার নামের পর্চায় লিখিত দাগ-নম্বর সমূহ ম্যাপে মিলিয়ে দেখলাম যে, আমাদের জমি কোন্ কোন্টা।

ভূগোলের মানচিত্রগুলোতে দেখেছি যে, এক ইঞ্জির সমান- ৫০, ৬০ কিংবা ৪০০, ৫০০ মাইল; আর সি.এস ম্যাপ খানা ষোল ইঞ্জির সমান এক মাইল। অর্থাৎ এক ইঞ্চির সমান মাত্র ১১০ গজ বা ২২০ হাত। অনেক সময় ভূগোলের মানচিত্র গুলোতে অঙ্কিত বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব মেপে দেখার ইচ্ছে হত, কিন্তু সে মাপ বাস্তব ক্ষেত্রের সাথে একরূপ হল কি-না, তা যাচাই করবার উপায় ছিল না। যেমন-বরিশাল হতে কলকাতা অথবা ঢাকা হতে করাচীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরত্ব মানচিত্রে মাপা গেলেও ভূপৃষ্ঠ মেপে ওর সত্যতা প্রমান করা সম্ভব নয়। কোন গ্রাম বা মৌজার সি, এস মানচিত্রে ওরূপ অসুবিধা নেই। কেননা এর পরিধি তত বড় নয়। সি, এস মানচিত্রের দুটি স্থানের দূরত্ব মেপে, তা সরেজমিনে যাচাই করে দেখতে আমার কৌতুহল হল।

সি,এস ম্যাপ খানার এক জায়গায় একটা স্কেল অঙ্কিত দেখতে পেলাম। ওতে একটা ইঞ্চি ছিল পাঁচ ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাগের মান ছিল ২২ গজ বা ৪৪ হাত, অতি সাদা সিধে ধরনের স্থূল স্কেল। দেখলাম যে, এতে মাপ চলে না। এক ইঞ্চিকে চল্লিশ ভাগে বিভক্ত করে আমি পীজ বোর্ড কাগজ দ্বারা একখানা স্কেল বানালাম। এর প্রত্যেক ভাগের মান হ'ল ৫.৫ হাত। আর বানালাম -১৮" হাতের ৫.৫ হাত দৈর্ঘ্য একট নল। ডিভাইডার বা কাঁটা বানালাম টিন দিয়ে। প্রায় ৫" ইঞ্চি লম্বা দুখানা টিন- এক দিক স্থূল ও একদিক সুক্ষ্ম করে কেটে, উভয়ের স্থূলাংশ একত্র করে একটা খিল মেরে এঁটে দিলাম। এতে কাজ চলার মত একটা ডিভাইডার তৈরী হ'ল। এভাবে জরিপী সরঞ্জাম সংগ্রহ করে একদিন ম্যাপ নিয়ে মাঠে নামলাম।

মনে পড়ে তখন মাঘ মাস। আমার বাড়ীর পূব পাশের জমিটা মাপতে শুরু করলাম। জমিটা আমার, সি, এস ম্যাপের ১৩৩১ নং দাগ। জমির একটা আ'লের উভয় প্রান্তে কাঁটা ধরে, উহা স্কেলে ফেলে দেখতে লাগলাম যে, ওতে স্কেলের কাটা পূরো ইঞ্চি বা ক'টা ক্ষুদ্রাংশ পড়ল। অতঃপর -প্রতি এক ইঞ্চির সমান ২২ হাত এবং প্রতি এক ক্ষুদ্রাংশের সমান ৫.৫ হাত ধরে হিসেব কষে বের করতে লাগলাম যে, আ'লটি লম্বায় কত নল বা হাত হ'ল। তৎপর সরেজমীন পরিমাপ। এ ভাবে জমিটার সব ক'টি আ'লই জরিপ করা হ'ল। কিন্তু ম্যাপের হিসাবও সরে জমিনের পরিমাপ একরূপ হ'ল না, কিছু বেশী বা কম দেখা গেল। আমি মনে করলাম যে, ওসব হয়ত আমার হিসাবের ভুল, নচেৎ কাঁটা ধরার দোষ। যা হোক, মাঠের কাজের ফাঁকে ফাঁকে জমি জরিপ করতে লাগলাম। কিন্তু কোন লোকজন সাথে নিয়ে নয়, একা একা।

তখন দক্ষিণ লামচরি তোরাপ আলী আকনজী ছিলেন একজন সুদক্ষ আমিন। আমি আমার জরিপ কাজের ইচ্ছা ও কায়দা সমূহ তাঁকে জানালে, তিনি বল্লেন যে, ওভাবে হিসেব কষে কষে জরিপ কাজ করা সম্ভব নয়, ওর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। সেটেলমেন্টের ম্যাপ-দ্বারা "হাত" এ জরিপ করতে হলে তার জন্য বিঘা-কাঠার স্কেল ও শিকল ব্যবহার করতে হয়। তিনি আরো বল্লেন যে, তাঁর একটা বিঘা-কাঠার স্কেল আছে, তিনি এখন আর ওটা ব্যবহার করেন না। কাজেই ওটা আমাকে দিতে পারেন এবং তাঁর শিকলটাও দিতে পারেন কিছু দিনের জন্য । আমি তাঁর স্কেল ও শিকল নিয়ে এলাম। পরে বরিশাল হতে লোহার মোটা তার কিনে এনে আকনজী সা'বের শিকল দেখে ও মেপে তার কেটে কেটে কড়ি ও আংটি বানিয়ে .২৪ বিঘা অর্থাৎ ২০ হাত দৈর্ঘ্য এক গাছা শিকল তৈরী করে আকনজী সা'বের শিকল ফেরত দিলাম।

স্কেল ও শিকল ব্যবহারের ফলে জরিপ কাজে আমার কিছুটা আত্মবিশ্বাস জন্মিল। অনেক জমি জরিপ করে দেখতে পেলাম যে, কোন জমির-ম্যাপের মাপে ও দখলের মাপে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যতিক্রম দেখা যায়, তা অনেক ক্ষেত্রেই দখলের ভুলের জন্য। সে ভুল শোধরানোটাই হ'ল আমিনের কাজ।

"আমিন" হিসেবে আমার দ্বারা প্রথম জমি জরিপ করালেন আমার প্রতিবেশী ও জ্ঞাতি চাচা মহব্বত আলী মাতুব্বর সা'ব। জমিটা তাঁর বাড়ীর পূব পাশে- সি, এস ম্যাপের ১৩৩৪-১৩৪০ নং দাগ। আমাকে বারবরদারী দিলেন এক টাকা।

এতদঞ্চলে জমি জরিপ কাজের দুটি প্রথা আছে-দেশী ও বিদেশী। দেশী প্রথায় জমি জরিপ করা হয়-হাত বা নলে ও পরিমাপকে বলা হয়-বিঘা, কাঠা বা কানি, কড়া ইত্যাদি এবং বিদেশী (ব্রিটিশীয়) প্রথায় জরিপ করা হয়-লিঙ্ক বা চেইনে আর পরিমানকে বলা হয়-একর বা শতাংশ [বিদেশী প্রথায় জরিপ কাজে গান্টারের চেইন ও স্কেল ব্যবহার করতে হয়, প্রথম আমার তা ছিল না। এমন কি জানাও ছিল না।] আমি অতি সহজ ভাবে দেশী প্রথায় জরিপ কাজ শুরু করি। কিন্তু এ প্রথায় নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাই বিদেশী অর্থাৎ আধুনিকী জরিপ পদ্ধতি শিক্ষায় উদ্যোগী হই।

১৩৫৩ সালের পৌষ মাসে লাহারাজ স্টেটের সার্ভে সুপারভাইজার বাবু বিজয় গোপাল বসু মহাশয় আমাদের গ্রামের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্রতাপপুর মৌজা জরিপ করতে আসেন এবং বহুদিন যাবত এখানে জরিপ কাজ করেন। সে সময় আমি তাঁর সহকারী রূপে কাজ করি এবং জরিপ বিষয়ক নানাবিধ যন্ত্রপাতি যথা-নর্থ কম্পাস, প্রিজমেটিক কম্পাস, সাইড ভ্যান, রাইট এ্যাঙ্গেল ইত্যাদির ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা করে লই।

বরিশালের "ফরিয়া পট্টি" নিবাসী বাবু ললিত মোহন সাহা ১৩৫৪ সালে আমাকে একটি গান্টারের চেইন উপহার দেন এবং স্থানীয় কাছেম আলী (পিং করিমদ্দিন) প্রদান করেন- প্রতাপপুর মৌজায় পড়ে পাওয়া একটি (পিতলের) গান্টারের স্কেল। এ সময় হ'তেই আমি বিদেশীয় প্রথায় জরিপ কাজ শুরু করি। কিন্তু জরিপ কাজের অন্যান্য যন্ত্রপাতির অভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারছিলাম না।

১৩৫৫ সালে স্থানীয় আমিন তোরাপ আলী আকনজী তাঁর কর্মজীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর ব্যবহার্য প্লেন টেবিল ও সাইড ভ্যানটি আমাকে দান করে যান। ১৩৫৬ সালে দক্ষিণ লামচরি নিবাসী নজর আলী (পিং বাছেরদ্দিন) দক্ষিণের চরে পড়ে পাওয়া একটি (নিকেলের) ড্রাইভার প্রদান করেন। জমিদারী উচ্ছেদ হ'লে ১৩৬৪ সালে লাখুটিয়ার জমিদার মিঃ পরেশ লাল রায়ের (ঘুঘুবাবুর) তৎকালীন ম্যানেজার বাবু অনন্ত কুমার বসু মহাশয় [তাঁদের অনাবশ্যক বিধায়] আমাকে প্রদান করেন- একটি নর্থ কম্পাস, একটি প্রিজম্যাটিক কম্পাস, চারটি রাইট এ্যাঙ্গেল ও একটি অপটিক্যাল স্কোয়ার। এর পর হতে কোন যন্ত্রপাতির অভাব না থাকায় আমি সুষ্ঠুভাবে জরিপ কাজ করতে সক্ষম হচ্ছি।

জরিপের বেশীর ভাগ কাজই হ'ল জমির সীমানা নির্ধারণ ও বাটারা করা। কিন্তু আমাকে মানচিত্র অঙ্কনের কাজ করতে হচ্ছে যথেষ্ট। এর মধ্যে আমার প্রধান দুটি কাজ হ'ল- ১৩৬৯ সালে চর বাড়ীয়া ইউনিয়নের ম্যাপ অঙ্কন ও ১৩৭৪ সালে চর মোনাই ইউনিয়নের ম্যাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্কন করা। এর পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয়েছি যথাক্রমে- ২০০.০০ ও ১৮৭.০০ টাকা।

জরিপ কাজে শুরু হতে আমার বারবরদারী (ভিজিট) ছিল নিম্নরূপ ঃ

১৩৩৩ সাল হ'তে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত (খোরাকী বাদ) দৈনিক ১.০০ টাকা

১৩৪৬ সাল হ'তে ১৩৫৩ সাল পর্যন্ত (খোরাকী বাদ) দৈনিক ২.০০ টাকা

১৩৫৪ সাল হ'তে ১৩৫৫ সাল পর্যন্ত (খোরাকী বাদ) দৈনিক ৫.০০ টাকা।

১৩৫৬ সাল হ'তে ১৩৫৭ সাল পর্যন্ত (খোরাকী বাদ) দৈনিক ৬.০০ টাকা

১৩৫৮ সাল হ'তে ১৩৭৭ সাল পর্যন্ত (খোরাকী বাদ) দৈনিক ৮.০০ টাকা

১৩৭৮ সাল হ'তে (খোরাকী বাদ) দৈনিক ১০.০০ টাকা

১৩৭৯ সাল হ'তে (খোরাকী বাদ) দৈনিক ১৬.০০ টাকা

১৩৮০ সাল হ'তে (খোরাকী বাদ) দৈনিক ২০.০০ টাকা

১৩৮১ সাল হ'তে (খোরাকী বাদ) দৈনিক ৩০.০০ টাকা

(জরিপ শিক্ষা বিষয়ক কোন বই পুস্তক পড়ার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি।)

AMARBOI.COM

আমার কর্ম-জীবনের চরম দুর্দিন হ'ল ১৩৩৪ ও ১৩৩৫ সাল। ১৩৩৪ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ আমি জ্বর ও মেহ রোগে আক্রান্ত হই এবং আমার একমাত্র ভগ্নি কুলসুম বিবি (জং আঃ হামিদ মোল্লা) সূতীকা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞাহীনা হয়ে পড়েন। আমি আমার রুগ্ন শরীর নিয়ে সপ্তাহখানেক আহার নিদ্রা ছেড়ে ভগ্নির শীয়রে বসে থেকে ৫ই পৌষ দেখলাম তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ। আমি শোক সংবরণে অক্ষম হলাম, শুরু হল আমার হৃৎকম্প (প্যাল্‌পিটেশন)। যদিও আমার হৃৎকম্প দুদিন পর কমে গেল, কিন্তু ২৭শে পৌষ ভগ্নির শ্রাদ্ধের দিন ভোজের সময় আবার হৃৎকম্প শুরু হল, আর কমল না। আমার চিকিৎসা চল্‌তে লাগল।

ফাগুন মাসে- মোল্লা সা'বের হাতের সামান্য আঘাতে আমার হালের বড় গরুটা মারা গেল এবং -চৈত্র মাসে গাছের সঙ্গে রশি জড়িয়ে পা ভেঙ্গে মারা গেল আমার একমাত্র গাভীটি। তহবিলে টাকা-পয়সা যা ছিল, তা এর আগেই নিঃশেষ হয়েছিল, হালের অপর গরুটি বিক্রি দিয়ে চালাতে লাগলাম আমার চিকিৎসা। কিছুদিন চিকিৎসা চল্লো গ্রামে, পরে জমি বন্ধক দিয়ে শহরে। চিকিৎসা চল্লো প্রায় ছয় মাস। আমার অবস্থা তখন এতই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে, আমি যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধান মতে- একজন মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপ থাকে ৯৮$^{৩}/_{৫}$ ডিগ্রী এবং নাড়ীর স্পন্দন থাকে প্রতি মিনিটে ৭৫ বার। এক ডিগ্রী তাপ বৃদ্ধিতে নাড়ীর স্পন্দন দশবার বাড়ে। এ হিসাবে কোন রোগীর নাড়ীর স্পন্দন এক মিনিটে ১৪৫ বার হলে, তার দেহের তাপ হওয়া উচিত ১০৬ ডিগ্রী। কিন্তু আমার দেহের তাপ ছিল ৯৮$^{৩}/_{৫}$ ডিগ্রী বা তার চেয়েও কম। অথচ নাড়ী স্পন্দন অর্থাৎ হৃৎস্পন্দন ছিল মিনিটে ১৪৫ বার। আহার ছিল প্রায় বন্ধ, বাহ্য হত মাত্র সপ্তাহে একবার। মারাত্মক উপসর্গ ছিল "অনিদ্রা"। ডাঃ আনন্দ মোহন রায় ৩০ গ্রেন মাত্রায় ব্রোমাইড দিয়েও আমার নিদ্রা জন্মাতে পারেন নাই। তবে ডাঃ ক্যাপ্টেন হরবিলাস চ্যাটার্জী "প্যারাল ডিহাইড" দিয়ে কয়েক দিন ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে উপকারের চেয়ে অপকার হয়েছে বেশী।

ডাঃ আনন্দ মোহন রায় ও ডাঃ হরবিলাস চ্যাটার্জী তিন মাস চিকিৎসা করেও কোন সুফল না পেয়ে একদা আমাকে বল্লেন যে, এ্যালোপ্যাথী শাস্ত্রে এ রোগের আর ওষুধ নেই। অর্থাৎ এ রোগ সারবার নয়। কবিরাজী খেতে শুরু করলাম। বরিশালের তৎকালীন প্রখ্যাত কবিরাজ - প্রসন্ন কুমার সেন গুপ্ত, গোপাল চন্দ্র সেন গুপ্ত ও মতিলাল সেন গুপ্ত আরো তিন মাস কাল চিকিৎসা করেও নিষ্ফল হয়ে একদা আমাকে বল্লেন- "এখন বাড়ীতে গিয়ে ভগবানকে ডাকতে থাকুন, আয়ুর্বেদে এ রোগের আর ঔষধ নেই"।

মোল্লা সা'ব আমার ভগ্নির মৃত্যু দেখতে আসেন নাই। তখন তিনি ছিলেন বেতাগী থানায়। তবে তাঁর শ্রাদ্ধের সময় ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এসে আমাকে মরণাপন্ন ফেলে আর চাকুরীতে যাননি। তিনি আমার আরো এক কেত্তা জমি বন্ধক রেখে ১৫০.০০ টাকা সংগ্রহ করে আমাকে নিয়ে ঢাকা যাত্রা করলেন (২রা আষাঢ় ১৩৩৫ সাল)। ঢাকা গিয়ে মিডফোর্ড হাসপাতালে আমাকে ভর্তি করলেন। ওখানে ডাঃ চারু বাবু ও ডাঃ সাহাবুদ্দিন সা'ব আমাকে দেখলেন, এক্সরে করলেন; ব্যবস্থা করলেন- কফোলেছিথীন, এ্যাফ্রোটোন ও এক দফে মিকচার।

২রা শ্রাবণ আমরা বাড়ীতে আসবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল যে, দু'জনের স্টিমার ভাড়া তহবিলে নেই। তখন ঢাকায় আমাদের পরিচিত এমন কোন লোক ছিল না, যার কাছে দুটাকা হাওলাত পাওয়া যেতে পারে। দায় পড়ে বাড়ীতে আসতে হচ্ছে মাত্র একজন। এখন সমস্যা হল - কে আগে আসবে। মোল্লা সা'ব আমাকে বল্লেন- "তুমি মুমুর্ষ রুগী, তুমি যদি ঢাকায় থাক আর মারা যাও; তবে সে সংবাদ পেয়ে বা না পেয়ে পুনঃ আমি ঢাকায় এসে হয়ত তোমার লাশও পাব না। আর তুমি আগে গিয়ে জাহাজে মারা গেলেও অন্ততঃ তোমার লাশটা বরিশাল পর্যন্ত পুঁছবে। কাজেই তুমিই আগে যাও।" আমি একাই বাড়ীতে এলাম এবং পরের দিন টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠালাম। তিনি টাকা পেয়ে পরে বাড়ী আসলেন।

ঢাকার ব্যবস্থা মোতাবেক ওষুধ কিনে ১০ই শ্রাবণ হ'তে উহা সেবন শুরু করলাম এবং এক মাস ঔষুধ ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করলাম (রোগারোগ্যের পরেও দুমাস ওষুধ সেবন করেছি।) কিন্তু দুর্বলতায় হলাম চল-শক্তি রহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্ত্র বয়ন শিক্ষা (১৩৩৫)

রোগারোগ্যের পর - শুয়ে-বসে প্রায় দু'মাস কেটে গেলে কোন রকম চলা-ফেরার শক্তি হ'ল কিন্তু কর্মশক্তি হ'ল না। তখন ভাবতে ছিলাম - কি করব। সে সময় এদেশে স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলন এবং টাকু-মাকু পুরাদমে চলছে। অর্থাৎ তাঁত ও চরকা ঘরে ঘরে। স্থির করলাম যে, বসে বসে (অল্প শ্রমের কাজ) কাপড় বোনা শিক্ষা করব।

মোঙ্গল হাটা নিবাসী ওসমান খাঁ নামক জনৈক তাঁতীর সহিত আমার পরিচয় ছিল। আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে আমি তাঁর বাড়ীতে গেলাম তাঁত ও কাপড় বোনা দেখবার জন্য। সেখানে বহু তাঁতীর বাস। আমি কয়েক বাড়ী ঘুরে ঘুরে খুব লক্ষ্য করে দেখলাম তাঁদের সূতা ভাতানো (মাড়দেওয়া), উঠানো, সুখানো, নাটাই ভরা, ননীভরা, তানানো, গোছানো, রাজভরা এবং ব-সুতা বাঁধা, মাকুচালানো (বোনা) ইত্যাদি সবই। অতঃপর কাগজে নক্সা আঁকলাম- তাঁত, চরকা, নাটাই, বাতাই, জাকী, নলী, রাজ, ব, মুঠা, পহ্নি ইত্যাদি যাবতীয় যন্ত্রপাতির এবং সঙ্গে সঙ্গে ওসবের প্রত্যেকটি অংশের মাপঝোক লিখে নিলাম। তবে কোন তাঁতে নিজ হাতে কাপড় বুনে দেখলাম না। কেননা ওঁদের বোনা দেখে মনে সাহস হল যে, উহা পারব। সব ঠিক মত বুঝে নিয়ে বাড়ীতে এলাম।

১৩৩৫ সালের ৭ই কার্তিক আমি নিজ হাতে তাঁত নির্মাণের কাজে লেগে গেলাম। সম্পূর্ণ তাঁত যন্ত্রটি ও তার আনুষঙ্গিক চরকা ইত্যাদি কাজে সরঞ্জাম (রাজ-মাকু বাদে) নির্মাণ করতে প্রায় তিন মাস কেটে গেল। ১৫ই মাঘ আমি কাপড় বোনা আরম্ভ করলাম।

জীবনে মাত্র একদিন কয়েক মুষ্টি কাপড় বোনা দেখে তার স্মৃতির উপর নির্ভর করে বড় সাইজের কাপড়ের "টানা" নিতে সাহস পেলাম না, প্রথম "টানা" টি নিলাম- ৪ X ১ হাত সাইজের গামছা কাপড় ২৫ খানা (১০০হাত)। প্রথম খুব আস্তে আস্তে মাকু চালাতে শুরু করলাম। "টানা"টি বুনে নামালাম বারো দিনে (দৈনিক ৮$^{১}/_{৩}$ হাত)।

দ্বিতীয় "টানা"টি নিলাম ৬ X ২ হাত সাইজের পরনের গামছা কাপড় ২৫ খানা (১৫০ হাত)। এ "টানা"টি বুনে নামালাম পনর দিনে (দৈনিক ১০ হাত)। এর পর লুঙ্গী ও তৎপর শাড়ী কাপড় বোনতে থাকি। বছর খানেকর মধ্যে আমার কাপড় বোনার ক্ষমতা হল দৈনিক ২৫ হাত (প্রায় দু বছর পর দুটি কারণে আমাকে কাপড় বোনা ত্যাগ করতে হয়। প্রথম কারণ হ'ল -স্বাস্থ্যের উন্নতির সাথে সাথে আমি পল্লী উন্নয়ন ও স্কুলের শিক্ষকতা কাজে জড়িত হয়ে পড়ি এবং দ্বিতীয় কারণ হল-সূতার মূল্যবৃদ্ধি ও মিলের কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড়ের মূল্য হ্রাস।)

উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা (১৩৩৫)

আগে বলেছি যে, আমাদের গ্রামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। বৃটিশ সরকারের বদৌলতে প্রতি ইউনিয়নে প্রাইমারী স্কুল ছিল একটি করিয়া (ডিঃ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হ'ত বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর নাম ছিল-"বোর্ড স্কুল")। আমাদের ইউনিয়নের "বোর্ড স্কুল"টি চর বাড়ীয়া মৌজায় অবস্থিত, দূরত্ব আমাদের গ্রাম হ'তে প্রায় ৫ মাইল। আর বরিশাল শহর ছাড়া হাইস্কুল ছিল না এ অঞ্চলে একটিও। কাজেই ১৩৩৪ সালের পূর্বে আমাদের গ্রামের কোন ছেলে-হাই স্কুল তো দূরের কথা, প্রাইমারী স্কুল ও চিনতো না।

১৩৩৪ সালে বরিশালের টাউন (হাই) স্কুলে ভর্তি হ'ল স্থানীয় ছাত্র- আঃ আজিজ মাতুব্বর ও ফজলুর রহমান মৃধা যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে এবং এ শ্রেণী অতিক্রম করল ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। এ সময় আমার স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হয়েছে। পরীক্ষার পর ওদের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক এনে আমি পড়তে শুরু করলাম। দিনের বেলা পড়বার সময় অল্পই পেতাম, বিশেষ ভাবে পড়তে হ'ত রাত্রে। কেননা তাঁত তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিলাম। বিশেষত- জীবনে যতটুকু পড়াশুনা করেছি, তা অধিকাংশই রাত্রে।

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য বই গুলো একবার পড়ে দেখে রেখে দিলাম এবং পঞ্চম শ্রেণীর -সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয় সমূহ নিয়মিত ভাবে পড়বার জন্য একটা "রুটিন" করে নিলাম। কিন্তু ইংরেজী নিলাম না। তার কারণ ইংরাজী পড়ায় আমার একটা অসুবিধে হচ্ছিল এই যে, কতিপয় ইংরেজী শব্দের "উচ্চারণ" সাধারণ নিয়ম মত হয় না, হয় এক অভিনব রূপে। আমার কতগুলো শব্দের কোন কোন "বর্ণ" লুপ্ত রেখে উচ্চারণ করতে হয়। যদিও এ অনিয়মটাও একটা "নিয়ম", তথাপি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া এ অসুবিধে কাটিয়ে ওঠা মুশ্‌কিল। বাংলা ভাষায় ওরূপ উচ্চারণ বিভ্রাট নেই, তা'নয়। তবে মাতৃভাষা বলে তা কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে ততটা কঠিন বোধ হয়নি, যতটা হচ্ছে ইংরেজীতে। একজন ইংরেজী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতে "রাজভাষা" নামক একখানা বই কিনলাম। বই খানায়-নিত্যাবশ্যকীয় যাবতীয় ইংরাজী শব্দের বঙ্গানুবাদ এবং উহার "উচ্চারণ" ভঙ্গি বাংলায় লিখিত ছিল। ওখানা পড়তে থাকলাম, রুটিন করে নয়; ইচ্ছাধীন রূপে।

নিয়মিত ভাবে পড়তে লাগলাম এবং ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও (১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে) বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে (৫ম শ্রেণীর) পাঠ্য বইগুলো পড়া সমাপ্ত করলাম। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি কি-না তা জানিনে। কারণ আমার পরীক্ষক-আমিই, অন্য কেউ নয়। আমার পরীক্ষার স্বরূপটি এই-বই গুলো ভাল ভাবে পড়ে পরীক্ষার জন্য তারিখ ধার্য করেছি এবং প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখের এক মাস (ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক পরীক্ষার ১৫ দিন) পূর্বে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দশটি করে প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করে বইয়ের পড়া বন্ধ করেছি, এমন কি হাতে লওয়াও। অতঃপর- নির্ধারিত তারিখে শুধু স্মৃতির সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর লিখেছি। পরীক্ষার পরে প্রশ্নোত্তরের সহিত বই মিলিয়ে দেখেছি যে, আমার উত্তর সমূহ কতটুকু ভুল বা নির্ভুল হয়েছে এবং তদনুপাতে নম্বর দিয়েছি। এতে কোন কোন বিষয় উত্তীর্ণ হতে পেরেছি, সব বিষয়ে পারিনি। তবে ওর জন্য আর স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিনি, স্থির করেছি ও সব বিষয় পরে শোধরে নেব। যা হোক এভাবে আমার পড়া চালাতে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(আঃ আজিজ ও ফজলুর রহমানের পুরোনো পাঠ্য বই গুলো যত্ন সহকারে এনে আমি নিয়মিত ভাবে পাঠ করেছি-১৩৩৫-১৩৪১ সাল পর্যন্ত (১০ম শ্রেণী)। ১৩৪০ সালে - আঃ আজিজ তার পিতৃ বিয়োগ হেতু পরীক্ষা না দিয়ে পড়া বন্ধ করে এবং ফজলুর রহমান মেট্রিক পাশ করে বরিশাল বি, এম কলেজে ভর্তি হয়। অতঃপর আমি ১৩৪২ ও ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত ফজলুর রহমানের "আই, এ" শ্রেণীর ১ম ও ২য় বছরের পুরোনো পাঠ্য বই গুলো অধ্যয়ন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার "বি, এ" শ্রেণীর পাঠ্য গুলো কোন কারণে আমার হস্তগত না হওয়ায়, তখন উহা পাঠ করিতে পারিনি। তবে উহা পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছি- আমার সেজ ছেলে আঃ খালেক (মানিক) এর- ঢাকা টি,এন,টি কলেজে "বি,এ" পড়বার প্রাক্কালে-১৩৮০-১৩৮১ সালে। ১৩৪৩ সালের পর হ'তে পাঠ্য পুস্তক পড়বার সুযোগ হারিয়ে ১৩৪৪ সালে হতে শুরু করি বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য হ'য়ে ওখানে পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা)।

জাল বুনা শিক্ষা (১৩৩৬)

ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি বিভিন্ন এবং প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন বা পণ্য দ্রব্য বিভিন্ন। আবার যে দেশে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় বেশী, সে দেশবাসীর পক্ষে সেই দ্রব্যই হয় প্রধান আহার্য ও ব্যবহার্য। যেমন সমতল ও নদীবহুল এই বাংলাদেশ। তাই এদেশে ধান ও মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য। কাজেই এ দেশবাসীর সর্ব প্রধান খাদ্যই হ'ল-মাছ ও ভাত। আর এ জন্যই বলা হয়- "মাছে ভাতে বঙ্গালী তুষ্ট"। এ কথাটা আমাদের গ্রামের পক্ষে বেশী সত্য। কেননা এ গ্রামটির প্রায় সব দিকেই নদী এবং ভিতরে ছোট-বড় খালও আছে পাঁচ-ছয়টি। নদী ও খাল গুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় বারো মাসই, যদি কেউ ধরতে জানে ও পারে।

এখন যদিও পূর্বের ন্যায় মাছের প্রাচুর্য নেই। তবুও আমাদের গ্রামের কতিপয় লোক বছরে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করছে মৎস্য বিক্রি দিয়ে।

মাছ ধরে খেলে যেমন পয়সা বাঁচে, তেমন পাওয়া যায় সুখাদ্য ও ধরার আনন্দ। আমি মাছ-মাংস খেতে ভালবাসি না, আমার প্রিয়-খাদ্য হ'ল নিরামিষ। তবুও মাছ ধরবার আগ্রহ যথেষ্ট। অনেকের "মাছ ধরা" একটা নেশা।

মাছ ধরার অনেক রকম পদ্ধতি আছে। যেমন জাল, বরশী, পলো, বেড়-গড়া, যোতী-কোচ, চাই-চাড়োয়া ইত্যাদি। আবার "জাল" অনেক রকম দেখতে পাওয়া যায়। যেমন-ঝাকী জাল, খোট্ জাল, খুতুনী জাল ইত্যাদি। হাতে অস্ত্র পেলেই যেমন যোদ্ধা হওয়া যায় না, তেমন-হাতে জাল-বরশী পেলেই মাছ মারা যায় না। এর জন্য আবশ্যক- যোগ্যতা ও দক্ষতা। অর্থাৎ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। মাছের -আহার, বিহার, চাল-চলন ও স্বভাব জানতে হয়। জানতে হয় মাছের মনোবৃত্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে মৎস্য শিকার করেছি। কিন্তু বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছি "জাল"। অনেকে মৎস্য-শিকারে আগ্রহী হ'লেও শিকার-যন্ত্র নির্মানে পারদর্শী নয়। হয়ত উহা কিনে নেয়, নতুবা অন্যকে দিয়ে বানিয়ে নেয়। কিন্তু মৎস্য শিকার অপেক্ষাও যন্ত্র নির্মানে আমার আগ্রহ বেশী।

ঝাকী, মইয়া, খোট, খুতুনী ইত্যাদি কতিপয় জাল আমাদের গ্রামের নিত্য ব্যবহার্য্য যন্ত্র। কাজেই ওগুলোর বয়ন ও ব্যবহার প্রনালী সহজেই শিখতে পেরেছি। কিন্তু কতিপয় জাল বুনা শিখতে হচ্ছে আমাকে দূরাঞ্চলে গিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিখারীর আত্মকাহিনী

দ্বিতীয় খন্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩৩৭ সালে "ঢ্যাং জাল" বুনা শিক্ষা করি রাজাপুর মৌজার (পানি ঘাটা) নিবাসী কদম আলী হাং এর ঢ্যাং জাল দেখে। তাঁর জাল খানা ছিল ছোট বড় চারি একার ফাঁসের বোনা বারো খন্ডে সমাপ্ত; মাপ ৩৫ x ৩২ হাত। আমি ঐ জাল খানা দেখে ওর একটা নক্সা এঁকে ও প্রত্যেক প্রকার ফাঁসের সংখ্যা ও মান লিখে আনলাম। অতঃপর জাল পাতবার কায়দা-কানুন জেনে নিলাম এবং বাড়ীতে এসে সূতা কিনে আনলাম। সূতা পাকাবার যন্ত্রপাতি যথা- চরকা, বাতাই, লগি- ইত্যাদি আমার প্রস্তুত ছিল। সূতা পাকিয়ে জালখানা (৩২ x ৩০ হাত) বুনা শেষ করতে (চার-পাঁচ জন লোকের) সময় লাগল প্রায় দুমাস, সূতা লাগে ৫৫ মোরা। (উক্ত জালখানা দ্বারা প্রায় চার বছর প্রচুর মৎস্য শিকার করে ১৩৪০ সালে বিক্রি করেছিলাম পাঁচিশ টাকা। অতঃপর ঐরূপ আর একখানা ঢ্যাং জাল বুনছিলাম - সালে এবং তদ্বারা মৎস্য শিকার করছিলাম প্রায় চার বছর।)

মৎস্য শিকারের আর একটি উন্নত শ্রেণীর যন্ত্র "ধর্মজাল"। ওটা বুনা আমি শিক্ষা করেছি চরমোনাই নিবাসী অছিমদ্দিন হাং এর বাড়ীতে গিয়ে, তাঁর জামাতা কাজেম আলী কাজী সাবের নিকট হ'তে। তিনি আমাকে "ধর্ম জাল" বুনিয়ে বা কোন পুরোনো জাল দেখাতে পারেননি। তবে তিনি বোনার প্রণালী সমূহ বলে দিচ্ছেন এবং তাঁর কথার ভিত্তিতে পরে আমি "ধর্মজাল" বুনেছিলাম। কিন্তু এ জাল খানা বোনায় আমি গতানুগতিক পন্থা গ্রহণ করিনি। জাল খানার গঠন ছিল বহুলাংশে আমার নিজ কল্পিত এবং উহা পাতবার কায়দা আমি করছিলাম সম্পূর্ণ অভিনব। আমার এ জালে মৎস্য ধরা পড়েছে এ জাতীয় অন্যান্য জালের চেয়ে বহু গুন বেশী। ... সাল হতে আমি বহুবার ঐ ধরনের জাল বুনেছি এবং এখন পর্যন্ত আমি ঐ ধরনের জালে মৎস্য শিকার করছি।

আমি বিভিন্ন সময়ে নিম্ন লিখিত জাল গুলো নিজ হাতে বয়ন করে মৎস্য শিকার করেছি।

ঝাকী জাল	ধর্ম জাল
খুটুনী জাল	ছাট জাল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোট জাল	বাধা জাল
সামুলা জাল	কাফাই জাল
ঢ্যাং জাল	মইয়া জাল

এছাড়া প্রস্তুত ও ব্যবহার করেছি- বেড়-গড়া, চাই-চাড়োয়া ইত্যাদি, বরশী ব্যবহার করেছি খুবই অল্প।

মোসলেম সমিতি;
স্কুল প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষকতা।
(১৩৩৬-১৩৪১)

আমার চাচাত ভ্রাতা (নিজ বাড়ীর) কদম আলী মাতুব্বর সা'বের প্রযত্নে তাঁর বৈঠকখানায়ে একটি পাঠশালা চলছিল । প্রায় দুবছর চলে ওটা বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষক ছিলেন কামিনী কুমার সরকার, নিবাস ছিল গৌরনদী। খোরাকী জমেত তাঁর মাসিক পাঁচ টাকা বেতন ধার্য ছিল। কিন্তু তা' ও না পেয়ে বেচারা চলে গেছেন দেশে। আমি উহা দেখছিলাম ও ভাবছিলাম যে, মক্তব পাঠশালা গুলোর একটা মারাত্মক রোগ হচ্ছে "ছাত্র-বেতন" অনাদায়। আর এই রোগেই গ্রামের মক্তব-পাঠশালা গুলো মারা যায়। এ রোগের প্রতিকার সম্ভব কি না।

২৮শে পৌষ, ১৩৩৬ সাল। আমাদের গ্রামের নেতৃস্থানীয় নয়জন লোক আমার বাড়ীতে ডেকে তাঁদেরকে বুঝালাম যে, কোন দেশ বা গ্রামের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে তথাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনগণের ঐকান্তিক আগ্রহের উপর। যেখানে জনগণের আগ্রহ নেই, সেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তা বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আসুন আমরা একটা সমিতি গঠন করে "সমবায়" পদ্ধতিতে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। অতঃপর সমিতির গঠন প্রণালী, কার্য-প্রদ্ধতি, উপকারিতা ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁদের জ্ঞাত করালাম। শুনে সকলে সম্মত হলেন এবং স্থির হল যে, গ্রামের সর্ব সাধারণকে ডেকে এনে এ মর্ম্মে একটি সাধারণ সভা করতে হবে। তারিখ ধায্য হল ৩রা মাঘ।

সভায় উদ্দেশ্য ও নির্দ্ধারিত তারিখ জানিয়ে প্রত্যেক বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে গ্রামের সবাইকে সভার নিমন্ত্রণ জানালাম। ৩রা মাঘ রাত্রে (১৩৩৬) আমাদের বাড়ীতে প্রায় দুশত লোকের এক সভা বসল এবং আঃ রহিম মৃধা সা'বের সভাপতিত্বে সভায় কাজ শুরু হ'ল।

সভার উদ্বোধনীতে সবাইকে সম্বোধন করে আমি বল্লাম-"বন্ধুগণ! আমরা লামচরি গ্রামের অধিবাসী। হালে, চালে, বেশভূষায় ও খেয়ে পড়ে আছি বেশ। কিন্তু চেয়ে দেখুন, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের পিছনের কাতারে লোক নেই। বর্তমান সময়ে দেশের সর্ব্ব ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আসছে। বিশেষতঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে আসছে বিপ্লব"। এই শিক্ষা বিপ্লবের যুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য গ্রামে এন্ট্রান্স, আই-এ, ও বি-এ (তখন 'মেট্রিক'হয় নাই) পাস ছেলের অভাব নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের গ্রাম খানিতে প্রাইমারী পাস আছে মাত্র একজন (সভাপতি সা'ব)। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের এতাধিক পিছিয়ে থাকার এক মাত্র কারণ হচ্ছে- স্থানীয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকা।

আমাদের গ্রামে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মক্তব-পাঠশালা জন্মেছে অনেক, মরেছে অনেক, জীবিত নেই আজ একটিও। এ রোগের একমাত্র কারণ হচ্ছে "বেতন বাকি"। যদি আমরা এমন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম, যার খরচের জন্য ছাত্র বেতনের উপর নির্ভর করতে হ'ত না, তা হ'লে আমাদের সে প্রতিষ্ঠনের আশু মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকত না।

শিক্ষকের বেতন শোধ করতে পারলেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে না, আনুসাঙ্গিক আরো অনেক খরচ বহন করতে হয়। যথা-(১) বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ নির্মান (২) টুল-টেবিলাদি নানা সরঞ্জাম সংগ্রহ (৩) আমাদের মত অনুন্নত গ্রামের জন্য রাস্তা নির্মাণ, চাড়-পোল দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়া আছে - গরীব ছাত্রদের বেতন মওকুফ করে ও তাদের পুস্তকাদি কিনে দেওয়া ও মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করা। আপনারা সম্মত থাকলে অতি সহজে আমরা উক্ত ব্যায় নির্বাহ করতে পরি। ওর জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা যায়, তা হচ্ছে - মুষ্টি ভিক্ষা আদায়, বিবাহে চাঁদা গ্রহণ, মসজিদ উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত গ্রহণ, স্বেচ্ছাকৃত দান গ্রহণ ও সম্ভাব্য ছাত্রবেতন আদায় ইত্যাদি।

সমবায় পদ্ধতিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বনাম পল্লী উন্নয়ন করতে হ'লে, তার জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা দরকার এবং তাতে থাকবে- অন্ততঃ এগার জন সদস্য এবং তন্মধ্যে একজন সভাপতি; একজন সম্পাদক ও একজন তহবিলদার।

অতঃপর আমার বক্তব্যের সপক্ষে কেহ কেহ এলেন। কিন্তু বিপক্ষে কেহ কিছু বল্লেন না। সর্বশেষে সভাপতি সা'ব- আমার প্রস্তাবসমূহের স্বপক্ষে যারা আছেন বা থাকবেন, তাদের হাত তুলে সম্মতি জানাতে বল্লেন এবং সকলে হাত তুলে সম্মতি জানালেন। তৎপর বিপক্ষে হাত তুলতে বলায় কেউ হাত তুল্লেন না। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত- এগার জন সদস্য দ্বারা একটি সমিতি গঠন করা হ'ল এবং তন্মধ্যে নির্বাচন করা হ'ল - আঃ রহিম মৃধাকে 'সভাপতি', আমাকে 'সম্পাদক' এবং কদম আলী মাতুব্বরকে 'তহবিলদার'। সমিতির নাম করণ করা হল "মোসলেম সমিতি"। মহোল্লাসের সহিত রাত বারোটায় সভা ভঙ্গ হ'ল।

পরের দিন বরিশাল হ'তে দু'শত ঘট কিনে এনে ৫ই মাঘ তা বিতরণ করলাম। সমিতির সদস্যবৃন্দ সহ প্রায় দু'শত লোকের এক শোভাযাত্রা বের হ'ল- হাতে নিশান ও মুখে নানাবিধ শ্লোগান দিয়ে। মুষ্টি-ভিক্ষা দানে সক্ষম, এমন সকল গেরস্তের ঘরেই ঘট প্রদত্ত হ'ল। এক সপ্তাহ পরে (১২ই মাঘ) মুষ্টি-ভিক্ষার চাল আদায় করা হ'ল। চালের পরিমান হ'ল দু'মন। নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক মুষ্টি ভিক্ষা আদায় হতে থাকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮শে ফাল্গুন সমিতির এক সভায় সাব্যস্ত হয় যে, ত্রিপুরা নিবাসী মুন্সী সেকান্দার আলী মিঞাকে দিয়ে আপাততঃ কদম আলী মাতুব্বরের বৈঠকখানায়ে স্কুল খোলা হবে এবং শিক্ষকের খোরাকী তিনিই বহন করবেন। শিক্ষকের বেতন ধার্য হ'ল মাসিক দশ টাকা। ২রা চৈত্র প্রথম স্কুল খোলা হ'ল। এদিন ছাত্র সংখ্যা হ'ল ১৭ জন।

২৬শে চৈত্র-বার্ষিক হিসাব নিকাশের জন্য এক সভা আহবান করলাম- এবং সদস্যগণ সব উপস্থিত হলেন। হিসাব হ'ল নিম্নরূপ ঃ

জমা		খরচ	
আলাউদ্দিন	১৪/৭	শিক্ষকের বেতন	
৩।।. দরে দাম	৫১.৩০	২-১৮দিন স ১০ =	২৬.০০
বিবাহের চাঁদা	১১.০০	রাস্তা নির্মাণ	২০.০০
মৃতের দান	৪.০০	বিবিধ খরচ	৫.০০
ছাত্র বেতন	৩০.০০		
মোট	৯৬.৩০	মোট	৫১.০০

খরচ বাদ - ৯৬.৩০-৫১.০০ টাকা = ৪৫.৩০ টাকা

মজুত হিসাব অনুমোদন হল।

AMARBOI.COM

সমিতির ও স্কুলের যাবতীয় খাতাপত্র কদম আলী মাতুব্বরের বৈঠকখানায় একটা আলমারীতে রাখা হচ্ছিল। একদা দেখতে পেলাম যে, স্কুলের কোন খাতাপত্রে 'সম্পাদক' পদে আমার নাম নেই, আছে- কদম আলী মাতুব্বরের নাম। শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন যে, কদম আলী মাতুব্বর চাকু দ্বারা ঘষে ফেলে আমার নামের স্থলে তাঁর নাম লেখিয়েছেন। শুনে আমি নিরব রইলাম।

একদা শিক্ষক সা'ব আমার কাছে তাঁর বেতন চাইলেন। তখন আমি তাকে বললাম যে, যিনি সমিতির সম্পাদক হবেন, তিনি মুষ্টি ভিক্ষা, ছাত্র বেতন ও চাঁদাদি আদায় করবেন এবং যাবতীয় খরচপত্র তিনিই করবেন। আপনার বেতন তিনিই দেবেন; আমি নয়। যেহেতু আমি সমিতির সম্পাদক নই। নিরুপায় হয়ে শিক্ষক সা'ব সমিতির সদস্যদের ও গ্রামের অন্যান্য বহুলোক নিয়ে এক সভার আয়োজন করলেন।

১৩৩৭ সালের ২৩শে বৈশাখ রাত্রে কদম আলী মাতুব্বরের বৈঠকখানায় সভা বসল, 'সম্পাদক' নির্বাচনী সভা। সম্পাদকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদম আলী মাতুব্বর সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অক্ষমতা জানালেন। সভাস্থ জনগণ সমিতির ও স্কুলের খাতাপত্র হ'তে আমার নাম কাটার জন্য তাকে নিন্দাবাদ করে আমাকে সমিতির ও স্কুলের 'সম্পাদক' পদে পুনর্নির্বাচন করেন।

কদম আলী মাতুব্বর ছিলেন একজন ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি সব সময় আভিজাত্য রক্ষা করে চলতেন এবং কথার রক্ষা করতেন ভারিক্কি, বলতেন অল্প। তিনি মনে করতেন যে, শ্রমিকের চেয়ে মালিকের মর্যাদা বেশী এবং শ্রমের চেয়ে পদমর্যাদার মূল্য বেশী। কিন্তু আমি মনে করি তার বিপরীত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাটে, সে উড়ে (আকাশচারী) এবং যে খাটায়, সে কুঁড়ে (অলস)। আমি দেখলাম যে, আমার ভাইয়ের শ্রমে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা থাকলেও তার পদমর্যাদার লিপ্সাটুকু প্রবল। তাই আমি সভায় প্রস্তাব করলাম যে, সম্পাদকের যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব আমিই পালন করব, অথচ আমার 'সম্পাদক' পদটা আমার ভাই সা'বকে দান করলাম। সবাই সমর্থন করলেন।

এ সময় আমাদের স্কুলের শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী সমেত হিন্দু ও মুসলমান মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০ জন। মাত্র একজন শিক্ষকের দ্বারা এখন আর এর শিক্ষা-কাজ চলতে পারে না। সভায় প্রস্তাব হ'ল যে, এখন হ'তে আমাকে শিক্ষক পদে কাজ করতে হবে। আমি সম্মত হলাম এবং পরের দিন (২৪শে বৈশাখ) শিক্ষা কাজে যোগদান করলাম।

"আপনি-খাট, পরকে খাটাও" আমি এই নীতির অনুসারী। স্বয়ং বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে অন্যকে দিয়ে কাজ করানো আমার রুচি বিরুদ্ধ। যে কোন কাজ অন্যের দ্বারা করানোর সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তখন নিজে কোন কাজ করছি কি না। কোন কাজ করলেত বেশ, না করলে কর্মরত ব্যক্তির কাজে শরিক হওয়া উচিত, যদি কাজ করবার ক্ষমতা থাকে। আমি আমার কর্ম জীবনে এ নীতিটী মেনে চলেছি সর্বত্র। এই নীতিটী অনুসরণ করেই আমি সমিতির কাজে অন্যান্যদের সাথে- মুষ্টি ভিক্ষার ছালা কাঁধে নিয়েছি, নদী সাঁতরিয়ে বাঁশ এনে খাল সাঁতরিয়ে চাড় দিয়েছি, যা কোন কোন মানী লোকের পক্ষে অপমান জনক।

সমিতির তহবিল এবং গ্রামের একটি ষাঁড় বিক্রির টাকা দ্বারা স্বতন্ত্র একখানা স্কুল-গৃহ নির্মাণ করে ১লা আষাঢ় (১৩৩৭) তারিখে উহা সঞ্চার করা হয়। এর পরের দিন সমিতির অনুমোদন ছাড়া কদম আলী মাতুব্বর তাঁর ব্যক্তিগত মতে- কড়াপুর নিবাসী মৌঃ আঃ লতিফকে স্কুলের শিক্ষক পদে নিয়োগ করেন। এর ফলে সতিতির সদস্যদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং ওর প্রতিবাদে ৫ই আষাঢ় এক সভা আহবান করা হয়। সাভায় কদম আলী মাতুব্বর তাঁর ত্রুটি স্বীকার করায় গোলমালের মিমাংসা হয়। তিন জন শিক্ষকের দ্বারা স্কুল এবং সমিতির কাজ যথারীতি চলতে থাকে।

এ সময় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১৫৩ জন। তৃতীয় শ্রেণী খোলা হচ্ছে, তবে তাতে ছাত্র সংখ্যা মাত্র তিন জন। স্কুলে অবৈতনিক ছাত্রের সংখ্যা ৫০ জন। ছাত্র বেতন, মুষ্টি ভিক্ষা ও অন্যান্য সহ সমিতির মাসিক আয় প্রায় একশ টাকা। অথচ তিন জন শিক্ষকের মাসিক বেতন ৩০ টাকা। অন্যান্য সহ মাসিক খরচ ৪০ টাকার বেশী নয়। আবশ্যকীয় সরঞ্জাম যথা - টুল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিল, চেয়ার, আলমারী, ব্লাক বোর্ড ইত্যাদি বানানো হল। স্কুলটির জন্য সরকারী মঞ্জুরী পেলাম, মুহসিন ফাণ্ড হতে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হল মাসিক ১২ টাকা। স্কুল সাবইন্সপেক্টর মৌঃ হাবিবুর রহমান সা'বের নির্দেশক্রমে যথারীতি খাতাপত্র সংগৃহিত হল এবং বাখর-গঞ্জ জিলা, বাংলা প্রদেশ, ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর মানচিত্র কেনা হল। আমি আমার নিজ হাতে কুঁদে কেটে বানিয়ে দিলাম একটি গ্লোব।

পূজোর বন্ধের পর ১০ই অগ্রহায়ণ স্কুল খোলা হ'লে দেখা গেল যে, মুন্সি সেকান্দার আলী, মৌঃ আঃ লতিব ও (আমার পরিবর্তে) ভোলা নিবাসী মৌঃ মুজিবল হক স'াব স্কুল খোলছেন। আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, সম্পাদক সা'ব কতিপয় সদস্যের যোগাযোগে মৌঃ মুজিবল হককে স্কুলে নিয়োগ করেছেন,আমাকে শিক্ষক পদে রাখা হবে না।

এ স্কুলটির প্রতি সম্পাদক সা'বের অধিকার ছিল তিনটি। যথা-(১) তিনি শিক্ষকের খোরাকী বহন করেন। (২) স্কুল গৃহটি তাঁর জমির উপর অবস্থিত। (৩) দান সূত্রে পেয়ে থাকলেও তিনি বর্তমানে সম্পাদক। কার্যকরি সমিতির সদস্য বৃন্দ ও স্থানীয় জনগণ সহ আমি একটি সাধারণ সভা আহবান করলাম, সম্পাদক সা'বের কাজের প্রতিবাদের জন্য নয়, বিদায় সম্ভাষন জানাতে।

১৭ই অগ্রহায়ন রাত্রে আমাদের বাড়ীতে আঃ রহিম মৃধা সাবের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা বসল। সভায় আমি বল্লাম- "বন্ধুগণ, বিগত ২৩/১/৩৭ তারিখের সভায় আমি আমার "সম্পাদক" পদটি ভাই সা'বকে দান করেছিলাম এবং চুক্তি ছিল যে, তিনি নামে মাত্র সম্পাদক থাকবেন, তাঁর যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করব আমি। কিন্তু বর্তমানে তিনি যখন তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য ভার স্বহস্তে গ্রহণ করতে উৎসুক, তখন আমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলতে ও করতে চাই না। আমি মোসলেম সমিতি গঠন করে আপনাদের সমক্ষে যে দায়িত্ব ভার গ্রহন করছিলাম, আপনাদের সমক্ষেই তা আজ আমি ত্যাগ করলাম এখন হ'তে সমিতির ও স্কুলের ভবিষ্যৎ ভাল বা মন্দের জন্য আমি দায়ী নই। আজ হতে আমি বিদায়।" অতঃপর আমি সমিতির ও স্কুলের যাবতীয় আয় ও ব্যায়ের হিসাব এবং কাগজপত্র সভাপতি সা'বের কাছে বুঝাইয়ে দিলাম। উপস্থিত জনগণের মধ্যে এ ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট বাক্ বিতন্ডা ও দলাদলির সূত্রপাত হল। সমিতির স্কুলে আমি শিক্ষকতা করলাম ৬ মাস ২৪ দিন।

মোসলেম সমিতির ঃ ভাঙ্গন

সমিতির স্কুলের ছাত্রদের আমি শুধু শিক্ষক ছিলাম না, ছিলাম বন্ধুও। অন্যান্য শিক্ষকের ন্যায় আমি শিক্ষা দানের সঙ্গে "বেত্র দান" করি নাই, করেছি স্নেহ, মমতা ও উৎসাহ দান। ছাত্রদের অবিভাবকদের নিকট আমি এই বলে ওয়াদা করেছিলাম যে, ছাত্রদের যাতায়াতের সুযোগ সুবিধে করে দেব, গরীব ছাত্রদের বেতন রেয়াত দেব এবং অত্যন্ত গরীব ছাত্রের বই-শ্লেটও কিনে দেব। বস্তুতঃ আমি সমিতিভুক্ত থাকা অবধি যথাসম্ভব ওসমস্ত পূরণ করেছি। কিন্তু আমি সমিতি ত্যাগ করায় ওসমস্ত হল অনিশ্চিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণ লামচরি কাজেম আলী সরদারের বাড়ীর মক্তবে আমাকে শিক্ষক পদে নিয়োগের প্রস্তাব করলে, আমি ২রা পৌষ (১৩৩৭) তারিখে সেই মক্তবে শিক্ষকতা করতে শুরু করি। ক্রমে সমিতির স্কুলের বহু ছাত্র ওখানে চলে যায়। পক্ষান্তরে- উঃ লামচরিবাসী হিন্দুগণ হিন্দু বিদ্বেষী মৌলুবীদের কাছে তাঁদের ছেলে পড়তে না দিয়ে করিমদ্দি মৃধার বাড়ীতে একটি পাঠশালা খোল্লেন। ফলে সমিতির স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমে গিয়ে সাবেক পর্যায় দাঁড়াল। অপর দিকে আদায়কারী অভাবে সমিতির মুষ্টি-ভিক্ষা, ও চাঁদাদি বন্ধ হয়ে গেল। তিন জন শিক্ষকের মধ্যে মৌলুভী দু'জন উঠিয়ে দেওয়া হ'ল এবং বেতন না পেয়ে শেষে (১৩৩৯ সালে) মুন্সি সেকান্দার আলী চলে গেলেন। সমিতির ও স্কুলের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ল। (স্কুল গৃহের ভিটির উপর বর্তমানে মরহুম কদম আলী মাতুব্বর সা'বের দেওয়াল ঘেরা মাজার অবস্থিত)।

দঃ লামচরির মক্তবটিতে এ যাবত সরকারের অনুমোদন ছিল না। মক্তবের ছাত্র বৃদ্ধি ও যথারীতি শিক্ষাদানের ফলে অচিরেই সরকারী অনুমোদন লাভ করলাম এবং সাহায্য মঞ্জুর হল মাসিক ৬ টাকা। ১৩৩৯ সালে সরকার পক্ষ মক্তব খানার জন্য একজন জি,টি পাস মাষ্টার রাখার আদেশ দেন। মক্তবটির সাবেক শিক্ষক মুন্সি আপছারউদ্দিন সা'বকে সহ আমাদের তিন জন শিক্ষকের বেতন পোশাবে না বলে - মিঠাইয় কাঠী নিবাসী মাষ্টার আঃ কাদের খাঁ সা'বকে ওখানে রেখে ২৫শে আশ্বিন (১৩৩৯) তারিখে আমি ওখান থেকে উঠে আসি। দঃ লামচরি মক্তবে আমার শিক্ষকতার কার্যকাল ১ বছর ৯ মাস ২৩ দিন।

এ সময় উঃ লামচরি করিমদ্দি মৃধার বাড়ীর স্কুলটির শিক্ষক ছিলেন সাহেব রামপুর নিবাসী মুন্সি আঃ মজিদ। তিনি চরমোনাই মোজার একটি বিয়ে করে তার শ্বশুরালয়ে চলে গেলে আমি ২৩শে পৌষ (১৩৩৯) তারিখে এ স্কুলে যোগদান করি। এ স্কুলটি এর পূর্বেই সরকারী অনুমোদন ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিল।

আমার বস্ত্রবয়ন ও শিক্ষকতা করার একমাত্র কারণ হ'ল স্বাস্থ্যহীনতা বা দূর্বলতাজনিত কৃষি কাজে অপারগতা। ইদানিং আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করে পুনঃ কৃষিকাজ শুরু করার মানসে ১৬ই কার্তিক (১৩৪১) তারিখ পর্যন্ত ১ বছর ৯ মাস ২৩ দিন শিক্ষকতা করে আমি উঃ লামচরি স্কুল হতে বিদায় গ্রহণ করি। সর্বসাকুল্যে আমার শিক্ষকতা কাজ করা হ'ল ৪ বছর ২ মাস ১০ দিন মাত্র।

পাঠাগার স্থাপন

(১৩৩৭)

আশৈশব আমার বই-পুথি পড়া একটা নেশা এবং উহা সংগ্রহ করা একটা বাতিক। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যখন যে বই-পুথি পেয়েছি বা নিজে কিনেছি, পড়া শেষ করে তা জমিয়ে রেখেছি ঘরে। কেহ কেহ হয়ত বলতে পারেন যে, বই পড়লাম, বোঝলাম, রসভোগ ও শিক্ষা গ্রহণ করলাম; উহা সংগ্রহের দরকার কি? ইহা বলতে বা ভাবতে তারাই পারেন, যারা ভাসা-ভাসা বই পড়েন, জ্ঞান পিপাসুরা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুস্তকাদি সংগ্রহের উপকারীতা অনেক। যেমন- (১) আলোচনা প্রসঙ্গে বা চিন্তা প্রসঙ্গে সময় সময় এমন কোন কোন বিষয় এসে পড়ে, কোনো পুস্তকের কোথায়ও দেখেছি বলে আবছা আবছা মনে পড়ে, পরিষ্কার ও বিস্তৃত ভাবে স্মরণে আসে না। তখন খুঁজে বইখানা দেখে নিতে পারলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। (২) প্রথম বার পড়ার চেয়ে এভাবে বই-পুথি পড়ায় স্মৃতিপটে দাগ কাটে ভাল। হয়ত আর বিস্মৃতি ঘটে না। (৩) এমন কতক বই আছে, যা একবার পড়ে তার ভাব বা মর্ম্ম উদ্ধার করা যায় না, বার বার পড়তে হয়। বই আয়ত্বে থাকলে তা সম্ভব হয়। (৪) এরূপ বই অনেক আছে, যা দু একবার পড়ে তৃপ্তি মেটে না, বার বার পড়তে ইচ্ছে হয়। হাতের কাছে বই থাকলে সে ইচ্ছে পূরণ সম্ভব হয়। এরূপ নানা ভাবে পুস্তক সংগ্রহের উপকারীতা আছে। সংগ্রহশালা একটি সিন্ধুক বিশেষ। কোন ধনী তাঁর যাবতীয় অর্থ পকেটে রাখেন না, রাখেন সিন্ধুকে এবং যথা সময়ে তা ব্যবহার করেন সিন্ধুক হ'তে। সংগ্রহশালা ঐরূপ একটি জ্ঞানের সিন্ধুক।

বিগত ১৩২৫ সাল থেকে আমি বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যেখানে যত বই পেয়েছি বা নিজে কিনেছি, সব বই মজুত করে রেখেছি, গ্রন্থশালা হিসেবে সুশৃঙ্খল ভাবে নয়, এলোমেলো ভাবে। এ সময়ে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থশালা প্রতিষ্ঠার জন্য আমার আগ্রহ হ'ল। কিন্তু আমার পুস্তক সমূহ সাজিয়ে গুছিয়ে দেখা গেল যে, ওর ভেতর সকল বিভাগের পুস্তক নেই। আমি সচেষ্ট হলাম–বাংলা ভাষার সকল বিভাগের কিছু কিছু বই সংগ্রহের কাজে।

শিক্ষিত বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের ঘরে দু-একখানা বই পুথি ছিল, তাঁদের বলতে লাগলাম যে, আমি একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার বা পাঠাগার স্থাপনের মনন করেছি, আপনারা আমাকে কিছু কিছু বই বা পুথি দিয়ে আমার ইচ্ছে পূরনের সহায়তা করুন। দু-একখানা বই-পুথি ঘরে রেখে উহা অযত্নে প্রতিপালন করার চেয়ে নিত্য নূতন বই, পুথি পড়া উত্তম। আপনারা যিনি আমার পাঠাগারে অন্ততঃ একখানা পুস্তকও প্রদান করবেন, তিনি আমার পাঠাগারের একজন শরিক বা সদস্য হবেন এবং আমার পাঠাগার হতে যে কোন পুস্তক পাঠ করার সুযোগ পাবেন। ইহা শুনে আমার অনেক সুহৃদ ব্যক্তি পুস্তক প্রদান করলেন। পুস্তক দাতাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন চরমোনাই নিবাসী বাবু যামিনী কান্ত বিশ্বাস ও হরেন্দ্র নাথ সেন বক্সি। তাঁরা উভয়ে দান করলেন ধর্ম, দর্শন, উপন্যাস ও নাটকাদি বিভিন্ন বিভাগে (বাংলা) ৩৫ খানা বই। এর মধ্যে "মনুসংহিতা" নামক বৈদিক ধর্ম গ্রন্থ খানা সবচেয়ে মূল্যবান। কিছু সংখ্যক বই নিজে কিনে নিলাম।

এভাবে পুস্তাকাদি সংগ্রহ করে ১৩৩৭ সালের ১৫ই আষাঢ় তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থগারটি বা পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করলাম। এ সময় আমার সংগৃহিত পুস্তকের সংখ্যা হ'ল- সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণ, পুথি ও মাসিক পত্রিকা সহ মোট ৭৮৭ খানা।

অনেকে আমার গ্রন্থাগারে এসে বই পুস্তক পড়তে বা নিতে ও দিতে শুরু করলেন এবং আমি (বই) আদান-প্রদানের খাতায় যথারীতি হিসাব লিখতে লাগলাম। যাবতীয় বইয়ের একখানা তালিকা তৈরী হচ্ছিল আগেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগৃহিত পুস্তকের সংখ্যা বাড়াবার জন্য নিরলস চেষ্টা চালাতে লাগলাম। বরিশাল কৃষি অফিস হ'তে কৃষি বিজ্ঞান' বিষয়ক কিছু সংখ্যক বই পেলাম এবং ব্যাপটিস্ট মিশন হ'তে ধর্ম বিষয়ক কিছু বই গ্রহণ করলাম। অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত সহ দশ বছরে (১৩৪৭ সালে) আমার সংগ্রহিত বইয়ের সংখ্যা হ'ল ৯৬৬ খানা। ৭৫

পরিতাপের বিষয় এই যে, আলমারী ছিলনা ব'লে বইগুলো রাখা হচ্ছিল আমার বৈঠকখানায় তাকে তাকে সাজিয়ে। ১৩৪৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ শুরু হ'ল সর্বনাশা ঘূর্ণী ঝড়। আমার বৈঠকখানা নিল উড়িয়ে, তৎসহ বইগুলোও। পরের দিন মাঠে-পথে পাওয়া গেল দু-একখানা ছেঁড়া পাতা। প্রায় বাইশ বছরের সাধনার ধন, হৃদয়ে রক্ত শুকিয়ে গেল। ব্যথা রোধ করতে পারিনি। যদিও প্রদাহটা আগের মত নেই, তথাপি হৃদয়ের ক্ষত আজও মোছেনি।

মনের দুর্দমনীয় আকাঙ্খা কমাতে না পেরে আবার পুস্তক সংগ্রহ শুরু করলাম। প্রায় ১৮ বছরের প্রচেষ্টায় পৌনে চারশ বই সংগ্রহ করলাম। কিন্তু ১৩৬৫ সালের ৬ই কার্তিক ঘটল- ১৩৪৮ সালের ১২ই জৈষ্ঠের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বন্যায় আমার জীর্ণ কুঁড়ে ঘরখানা ভেঙ্গে পড়ল এবং বইগুলো উধাও হয়ে গেল (মনে হয় যে, উহা মাঠে পড়ে বানের জলে ভেসে গেছে)। সেদিন হ'তে হ'ল আমার প্রায় ৪০ (১৩২৫-১৩৬৫) বছরের সাধনার নিষ্ফল পরিসমাপ্তি। তৎপর আর কখনো পুস্তক সংগ্রহ করবার উৎসাহ আমার মনে জন্মেনি।

এখন শুধু মনে মনে ভাবি -

সাধনা হ'লনা সিদ্ধ	বিধাতার (প্রকৃতির) দোষে।
সুকর্মে মেলেনি ফল	দারিদ্রতা রোষে।
ভাগ্যবাদ ছেড়ে করি	কর্মবাদে ভক্তি,
তাই মম চির কাল	কর্মেতে আশক্তি।
করমে মেলেনা ফল	একি নহে ভাগ্য?
(তাই) চাহে মন কর্ম ত্যাজি	লভিতে বৈরাগ্য।

পাখা তৈয়ার

(১৩৩৯)

যে কোন রকম ইঞ্জিন মেশিনের কল-কব্জাগুলো তন্ন তন্ন করে দেখা, আমার একটা স্বভাবজাত কৌতুহল। এ কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য আমি যখন যেখানে যে কল-কব্জা পেয়েছি, তা খুব লক্ষ্য করে দেখেছি (উহা আজো দেখে থাকি) জানতে চেষ্টা করেছি যে, ওর মূল শক্তি কোথায়, কোন্‌টা চললে কোন্‌টা চলে ইত্যাদি। কিন্তু ইঞ্জিন মেশিনের দেহ দর্শন ছাড়া ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ন্তদর্শনের সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি। তবে ও সম্বন্ধে উৎসাহের বিরাম নেই আজো, যেমন দেখবার, তেমন গড়বার।

আমার শৈশবের "কৃত্রিম জলের কল" বানাবার উৎসাহের মত একটা উৎসাহ হল "কৃত্রিম বৈদ্যতিক পাখা" বানাবার।

টিন কেটে তিনখানা পাতির সমন্বয়ে একখানা পাখা বানালাম বৈদ্যুতিক পাখার মতই এবং উপরে মোটর বক্সের মত একটা বাক্সও বানালাম। তবে তার মধ্যে আমি রাখলাম মোটরের পরিবর্তে দুটি ক্রাউন পিনিয়ন। ওর একটার সঙ্গে সংযুক্ত করলাম পাখাটি এবং অপরটার সাথে একটা শায়িত দণ্ড, যার অপর প্রান্ত থাকল কোন স্থানে দূরে। সেই দূরপ্রান্তেও একটি বাক্সে দুটি ক্রাউন পিনিয়ন রাখলাম, যার একটার সঙ্গে যুক্ত করলাম পূর্বোক্ত শায়িত দন্ডটি এবং অপরটির সঙ্গে একটা খাড়া দন্ড। এই খাড়া দন্ডটির নিচেও অনুরূপ একটি বাক্সে দুটি ক্রাউন পিনিয়াম রাখলাম যার একটির সাথে যুক্ত করলাম খাড়া দণ্ডটি ও অপরটির সঙ্গে হাতল। এতো করে হাতলটি ঘুরালে পাখাটি ঘোরে। দণ্ড দুটি বানালাম লোহার শিক দিয়ে আর পিনিয়ন, পিনিয়ন বক্স ও অন্যান্য অংশ তৈরী করলাম কাঠের দ্বারা। মাস খানেক সময় লাগল পাখাটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে।

১৩৩৯ সালের ১৬ই বৈশাখ তারিখে লাখুটিয়ার জমিদার ও পূর্ব বাংলা রেলওয়ের ডি, টি, এস মিঃ পরেশ লাল রায় (ঘুঘু বাবু বা ফ্রেঞ্চ সাহেব) আসবেন, স্থানীয় রহম আলী মাতুব্বরের বাড়ীতে। কয়েক দিন পূর্বে খাজনা আদায়ের জন্য তিনি এখানে এসেছেন বজড়া নিয়ে। তিনি কদম তলায় খালে বোট রেখে খাজানা তহশিল করছেন। মাতুব্বর বাড়ীতে সাহেবের অভ্যর্থনার আয়োজন বিপুল। শুধু সাহেবের খোরাকীর ফর্দেই পদের সংখ্যা ৮০টি।

মাতুব্বর সা'ব তাঁর বৈঠকখানা সাজাতে অনুরোধ জানালে আমি সম্মত হলাম এবং তিনি আমার ফরমায়স মত সাজ-সরঞ্জাম ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনে দিলেন।

নির্ধারিত তারিখের ৫ দিন পূর্বে কতিপয় সহকারী নিয়ে ঘর সাজাতে শুরু করলাম। নানাবিধ রঙ্গিন কাগজ ও মিনাপাত কেটে বিবিধ রকম লতা-পাতা, ফুল ইত্যাদি বানিয়ে ঘরখানা সাজালাম, দরোজার প্রবেশ পথে গেট বানালাম। গেটের দুপাশে দাঁড় করালাম দুজন দারেয়ান।

দ্বারীদ্বয় কাগজের তৈরী। প্রথমতঃ কাগজে অঙ্কিত করলাম-পাঁচ ফুট লম্বা দুটি মানুষ, পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে জামা, পায়ে জুতো, মাথায় লাল রং এর পাগড়ী ও কাঁধে বন্দুক। পরে ছবি দুটো পীজ বোর্ড কাগজে লাগিয়ে ছবির সাইজ মোতাবেক কেটে নিলাম। তৎপর গেটের দুপাশে দুটো খাম পুতে তার সঙ্গে দাঁড় করালাম দারোয়ানদের। দূর হতে দেখে কেউ ভাবতেই পারল না যে, ওরা বাস্তব দারোয়ান কি না। অতঃপর আমার তৈরী কৃত্রিম বেদ্যুতিক পাখাটি ফিট করলাম বৈঠক খানায়ে সাহেবের বসবার জায়গাটির সোজা উপরে। একজন যুবককে পাখাটি চালাবার কৌশল শিখিয়ে বলে রাখলাম "সাহেব এসে বসা মাত্র চালিয়ে দিও"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বেই ওখানে বিস্তর লোক-সমাগম হচ্ছিল। যথা সময় সাহেব আসলেন, সঙ্গে তাঁর সহধর্মিনী মিসেস ইন্দিরা দেবী (ইনি একজন প্রখ্যাত অভিনেত্রী। চলচ্চিত্রে "আলী বাবা" ছবি খানাতে ইনি মর্জিনার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন) ও পুত্র হ্যারিকেল। উঁহারা দরজায় এসে সাজ গোজ দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়ে গেলেন। নতুন বা আজব কিছু দেখলেন বলে নয়, অশিক্ষিত কৃষক পল্লীতে ইহা অপ্রত্যাশিত বলে। বৈঠক খানার চেয়ার-টেবিল সাজানো ছিল। সাহেব সেখানে গিয়ে বসতেই মাথার উপরে পাখা চল্‌তে শুরু করল। সাহেব হঠাৎ দাঁড়ালেন এবং দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "ইলেকট্রিক ফ্যান? কারেন্ট কোথায় পেলে?" আঃ রহিম মৃধা সাব কাছে ছিলেন। তিনি বল্লেন যে, ওটা কারেন্টে চলে না, হাত দিয়ে চালাচ্ছে। পাখাটির চালক ছিল বাইরে এবং সংযোগকারী দণ্ডটি ছিল আড়ালে। তাই পাখাটি চলার সূত্র ধরতে না পেরে সাহেব জানতে চাইলেন যে, ওর চালক কোথায়। মৃধা সা'ব বল্লেন "চালক মাতুব্বর"। শুনে সাহেব দ্রুত বাইরে গেলেন, আমরাও গেলাম। তিনি পাখা চালানো দেখলেন, বাক্স খুলে পিনিয়নাদি ও ফিটিং প্রণালী দেখলেন; পরে বৈঠকখানায় বসে জানতে চাইলেন যে, ওটা বানিয়েছেন কে। মৃধা সা'ব আমাকে নির্দেশ করে দেখালেন আর বল্লেন যে, পাখাটি উনি বানিয়েছে এবং ঘরদোর উনিই সাজিয়েছে; দারোয়ানের মূর্তিটাও বানিয়েছে উনি। উনি আমার জ্ঞাতি ভাই, নাম আরজ আলী মাতুব্বর।

সাহেব একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। জন্মস্থান ইংল্যাণ্ড, মাতৃভাষা ইংরাজী। বাংলা ভাষা ভাল ভাবে বলতে পারেন না। তিনি মৃধা সাবকে বল্লেন "মৃঢা! টোমার ভাইকে হামার সাঠে ডেও, হামি ওকে ইঞ্জিনিয়াবিং শিখাবে"। মৃধা সা'ব বল্লেন যে, উনি গরীব মানুষ, কলকাতায় থেকে ট্রেনিং দেওয়া ওনার পক্ষে সম্ভব নয়। সাহেব বল্লেন "ক্যালক্যাটা ইণ্ডিয়ান অটোমোবাইল ইন্‌স্‌টিটিউটের হেড সা'ব হামার বন্‌ডু আছে, ওখানে বেটন ডিটে হবে না, খাওয়া ও অন্য খরচা হামি ডেবে, রেল-স্টিমারে পাস ডেবে। বল, যাবে ? মৃধা সাহেব আমার মতামত জানতে চাইলে আমি বল্লাম "মার কাছে জিজ্ঞেস না করে বলতে পারি না"। সাহেব বল্লেন "জিজ্ঞেস করে আস"। তৎক্ষনাৎ বাড়ীতে এসে মা-কে উহা জানালে তিনি সম্মতি দিলেন এবং সাহেবের কাছে গিয়ে আমিও সম্মতি দিলাম। সাহেব বল্লেন যে, মফস্বলের কাজ সারতে তাঁর আরো প্রায় দুমাস সময় লাগবে, আষাঢ় মাসে তিনি কলকাতা যাবেন এবং তিন মাসের ছুটি নিয়ে লণ্ডন বেড়াতে যাবেন (মামা বাড়ী)। পূজোর বন্ধের পর হয়ত কার্তিক মাসে তিনি পুনঃ কলকাতায় গেলে আমাকে ইণ্ডিয়ান অটোমোবাইল ইনস্‌টিটিউটে ভর্তি করা হবে।

ঘন্টা খানেক নানা আলোচনার পর সাহেব চলে গেলেন। তাঁর ভোজ্য সামগ্রী সমূহ বোটে পাঠানো হল। সাহেব যাবার সময় আমাকে পারিতোষিক দিলেন দশ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঞ্জিনিয়ারিং শিখার উদ্যোগ ও মাতৃবিয়োগ

(১৩৩৯)

এখন হ'তে একটা নতুন আশার আলো দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হলাম এবং কর্মজীবনের নতুন পথের মাইল পোস্ট গুনতে লাগলাম।

একদা কোন কার্যোপলক্ষে চরবাড়ীয়া (বড় বাড়ী) মোতাহার উদ্দিন হাওলাদারের বাড়ীতে গিয়ে একখানা বই দেখতে পেলাম এবং তাঁর নিকট চেয়ে বই খানা নিয়ে এলাম। বই খানার নাম "মটর শিক্ষক" লেখক শৈলেন্দ্র নাথ দত্ত, অধ্যক্ষ-ইণ্ডিয়ান অটোমোবাইল ইন্‌স্‌টিটিউট, কলিকাতা।

বই খানায় আছে বিভিন্ন ধরনের ডিজেল ইঞ্জিনের যাবতীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের বিস্তৃত বিবরণ। যথা- সিলিণ্ডার, পিস্টন, কারবুরেটার, গিয়ার, ফ্লাই হুইল, সাক্সনফ্যান, স্টিয়ারিং হুইল ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে ও সবের ভিতর ও বাহিরের ছবি এবং উহাদের কর্যকারীতা, প্রস্তুত বিধি, ফিটিং প্রণালী ইত্যাদিও। এতদ্ভিন্ন আছে স্টার্টিং ক্লিয়ারিং, কোল্টিং ইত্যাদি বিষয়ের বিষদ আলোচনা। ইঞ্জিন বা মেশিনের কোন্ অংশটি কোন্ ধরনের লোহার তৈরী, তার পাইন পদ্ধতি এমন কি গাড়ীর রং করা সম্বন্ধেও বই খানায় উপদেশ আছে। মূলতঃ ডিজেল ইঞ্জিন বা মটর গাড়ী সম্বন্ধে এমন কোন যন্ত্র বা জ্ঞাতব্য বিষয় নেই, যার সম্বন্ধে এ বই খানিতে কিছু না কিছু বলা হয় নি।

মাত্র মাস ছয়েক পরে যে বিষয়ে যাঁর ছাত্র হ'তে চলেছি, তাঁরই লেখা সে বিষয়ের বই খানা পেয়ে আমি, অতিশয় আনন্দিত হ'লাম এবং মনে হ'তে লাগল। আমি যেন এখন হতেই তাঁর ছাত্র হচ্ছি। বই খানা রীতিমত পড়তে লাগলাম।

ক্রমে কার্তিক মাস এল। মটর শিক্ষক বই খানা বাস্তবিকই আমার শিক্ষকের কাজ করল। বই খানা- বিষয় গুলো বুঝে, ছবি গুলোর সাথে মিলিয়ে পড়লে পাঠককে প্রায় ব্যবহারিক জ্ঞান দান করে। বই খানিতে (বাংলা পরিভাষার -অভাবে) কলকজার নাম যদিও ইংরাজীতে লিখিত হচ্ছে, তথাপি উহা পড়তে ও বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হ'ল না। আমার মনে হল আমি যেন দুবছরের শিক্ষাসূচীর মধ্যে এক বছর এগিয়ে গেছি।

কার্তিকের শেষ ভাগে আমি কলকাতায় যাবার প্রস্তুতী নিতে শুরু করলাম। পোষাক পরিচ্ছেদ ও বিছানাপত্র সংগ্রহ করলাম এবং বরিশালে সাহেবের সদর দপ্তরে গিয়ে সাহেব কলকাতায় আসবার সংবাদ নিতে লাগলাম। একদা সদরে জানতে পেলাম যে, সাহেব কলকাতায় আসবেন নাগাত ৩০ শে কার্তিক।

বাড়ীতে এসে মাকে জানালে তিনি বল্লেন যে, আমার কলকাতা যাবার পূর্বে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একদিন বিদায় ভোজ দরকার। এ জন্য তারিখ ধার্য করলাম। ভোজের আয়োজন চল্লো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩শে কার্তিক ভোজন পর্ব, ভোজ্য দ্রব্যের প্রস্তুতি চলল সারাদিন। অতিথী নাইওরী ও ছেলে পুলের কোলা হলে অতীষ্ঠ হয়ে উঠলাম, তবুও বিরক্তি নেই, আছে আনন্দ। ভোজপর্ব রাত্রে। মেহমানরা সবাই এলে ভোজ পর্ব শেষ হ'ল রাত দশটায়। বিদায় কালে মেহমানরা অনেকে আমাকে দাওয়াত করলেন। আমি বিভিন্ন কুটুম্ব বাড়ীতে ৩০ শে কার্তিক পর্যন্ত দাওয়াত কবুল করলাম এবং স্থির হল যে, ১লা অগ্রহায়ণ আমি কলকাতা যাত্রা করব। খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাত ১১টায় আমি বিশ্রাম নিলাম ভুজ্যাবশিষ্ট ও পাত্রাদি গুছিয়ে রেখে, মা বিশ্রাম নিলেন কিছু সময় পরে।

রাত একটার সময় মা'র ডাকে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে। শোনতে পেলাম মা কাতর কণ্ঠে ডাকছেন- "কুডী, ও কুডী, আমারে ধর"। বাতি জ্বালিয়ে মা'র কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, মা পা মেলে ঈষৎ চিতভাবে বসে আছেন, হাত দুখানা পিছন দিকে মাটিতে ঠেশ দেওয়া, মুখ মেলে অতি কষ্টে শ্বাস করছেন। মা আর একবার মৃদু স্বরে বল্লেন "আমারে ধর।" আমি বাঁচমু না। হামজার মায়রে বোলা। মরণে বড় কষ্ট"।

আমি মা'র পিছনে বসে তাঁর গ্রীবার নীচে আমার হাত রেখে তাঁর মাথাটি তুলে ধরলাম, মা নিজেকে আমার কোলে এলিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মা'র শ্বাস ও কষ্ট দুই-ই কমে এলো। হামজার মা অর্থাৎ আমার চাচীকে ডাকা হল। তিনি এসে দেখলেন যে, মা নীরব-নিষ্পন্দ। মাত্র দশ মিনিট সময়ের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। ঘরের ও বাড়ীর অন্যান্য সবাই জেগে উঠল। কিন্তু মা'কে কেউ জীবিত দেখতে পেল, কেউ পেল না, শোয়ানো হল মুর্দা রূপে।

উপস্থিত বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে মা'র জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা-অনুশোচনার ঝড় বইতে লাগল। একান্ত দরদীরা কাঁদতে লাগল। কিন্তু আমার কাঁন্না এলোনা। কি হচ্ছিল এবং কি হ'ল, ভেবে কোন কুল পেলাম না। একবার মনে হ'ল আমার যেন কেউ নেই, কিছু নেই, রোগ, শোক, দুঃখ, বেদনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাও নেই। শেষমেশ (সম্বিৎ হারাইলাম) আমি যেন নিজেও নেই। জ্ঞানোদয় হ'লে আবার মনে হতে লাগল এ যেন আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি। ঘুম ভেঙ্গে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, প্রভাত হলেই মা আমাকে "কুডী" বলে ভাত খেতে ডাকবেন।

আগুন যেমন জ্বলে ওঠতে না পারলে সৃষ্টি হয় ধুয়াঁ, তেমন আমার শোকাগ্নি রোদন রূপে প্রকাশ হতে না পেরে সৃষ্টি হল ধুয়া। মা'র শিয়রে বসে সে ধুয়া (গান)টি লেখলাম- (রাত তিনটায়)

(আমার) সংসার সাগর মাঝে সুখ তরিতে
(আমি) শান্তি মালে বোঝাই দিয়েছিলে তাহাতে।
মহানন্দে পাল তুলিয়ে
ঘুমে ছিলেম সব ভুলিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনলাম হঠাৎ মোরে
মা-জী বলছে "ওরে
(তুই) সজাগ হয়ে দেখনা চেয়ে আঁখেতে।"

(বলো) "দেখ এসে গেল ভেসে শান্তি ভরা তোর।"
(আমি) ডাক শুনিয়ে গেলাম কাছে হইয়ে কাতোর।
(বলে) "আচম্বিতে আসল ঝড়ী
ধর বাছা তোর সুখের তরি।"
নিকটে গিয়ে সাথে
ধরলাম ডান হাতে।
(বলে) "আজ ডোব্বে তরি কাল শমনের বড় জোর"।

(আমার) সুখ তরনী মা জননী ছিল চিরকাল।
শান্তি বোঝাই ছিল তাতে [illegible] ছিল পাল।
(আমার) হাতের [illegible] হাতে ধরা,
দশ মিনিটে [illegible] ভরা
ডুবল সুখনা- পরে;
নদী নয়, বসত ঘরে।
আরজ বলে "উদ্ধারিও হে বিভু। তাঁর পরকাল"।

AMARBOI.COM

বহুদিন হতে আমার একটা আশা ছিল যে, মা'র একখানা ফটো তুলে ঘরে রাখব। কিন্তু এ পর্যন্ত তা সফল করতে পারিনি। ইচ্ছা হল আজ উহা করব। রাত চারটের সময় যাত্রা করে ভোরে বরিশাল পুঁছে (সদর রোড) ফটোগ্রাফার মথুর বাবুকে নৌকো করে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। তখন বেলা আটটা। বাড়ীতে লোক জনের অভাব নেই, কবর খোঁড়া হচ্ছে। মা'র ফটোতোলাবার আলোচনা শুনে এক দল আত্মীয় (মুছুল্লি) বলে ওঠলেন যে, ফটোতোলা হলে এ মুর্দা তাঁরা দাফন করবেন না। অপর একদল বলতে লাগলেন যে, মুর্দার ফটো তোলা বা মুর্দা সম্বন্ধীয় অন্য কোন নীতি গর্হিত কাজের জন্য কখনো মুর্দা দায়ী হতে পারে না, সে জন্য দায়ী তাঁর ওয়ারিশ। এ জন্য আমরা তাঁর ওয়ারিশের কেছাছ (শাস্তি বিধান) করতে পারি। কিন্তু দাফন না করে, ফেলে রেখে, শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য করে মুর্দাকে শাস্তি দিতে পারি না।

সদরের বহু কাজ ত্যাগ করে মফস্বলে ইঞ্চি দরে ফটো তোলতে মথুর বাবু আসেন নি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছেন চুক্তি নিয়ে নিয়ে বিশ টাকায়। ফটো তোলা হো'ক আর না হো'ক, তাঁকে উহা দিতেই হচ্ছে। কাজেই ফটো তোলা হ'ল। দঃ লামচরি নিবাসী আঃ গফুর মৃধা ও কাজেম আলী সরদার প্রমুখ কতিপয় খাছ মুছুল্লি গোনহ্ (দাফন) না করে বাড়ীতে চলে গেলেন (হায়রে ধর্ম, হায়রে কু-সংস্কার)। আম মুছুল্লিগণ মাকে দাফন করলেন।

মাকে দাফন করা হলে আমি তাঁর সমাধি পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্বোধন করে মনে মনে বল্লাম "মা! আজীবন তুমি ছিলে ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। তুমি কখনো নামাজের 'কাজা' করনি, করনি কখনো তহবিহ তেলায়াত ও তাহাজ্জুদ নামাজে গাফিলতী। আর আজ সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে এক দল মুছুল্লি তোমাকে করতে চাইল শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য, তাঁদের কাছে হলে তুমি তুচ্ছ, অবহেলিতা ও বিবর্জিতা, হলে নিন্দা ও ঘৃনার পাত্রী। সমাজে আজ সর্বত্র বিরাজ করছে ধর্মের নামে 'কুসংস্কার'। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর- আমার জীবনের ব্রত হয় যেন 'কুসংস্কার দূরীকরণ অভিযান'। আর সে অভিযান স্বার্থক করে আমি যেন তোমার কাছে আসিতে পারি। আশীর্বাদ কর, মোরে মা। আমি রেখে আসতে পারি যেন সেই অভিযানের দামামা"। মাত্র তিন বছর বয়স্কা একটি কন্যা সহ স্ত্রীকে একা ঘরে রেখে আমার কলকাতার যাওয়া আর সম্ভব হল না, জীবনোদ্দেশ্যের উচ্চআকাঙ্খায় দিতে হল জলাঞ্জলী এবং পত্রে ঘুঘু সাহেবকে জানানো হল আমার কলকাতায় না যাবার কারণটি।

AMARBOI.COM

"সীজের ফুল" রচনা
(১৩৪০)

যেখানে সেখানে বসে যখন তখন ছোট ছোট কবিতা লেখাটা আমার পুরোনো অভ্যাস। অবসর সময়ে হতের কাছে একটা কলম আর একটুকরা কাগজ পেলে হয়ত দু-চার চরনে একটা কবিতা লেখতাম। কোন কোন সময় পথে-প্রান্তরে বসে গাছের পাতায়ে কাঁটা দ্বারা লেখতাম। ও গুলো ফেলে দিতাম না, ঘরে জমিয়ে রাখতাম। ওর বেশী ছিল নীতিমূলক কবিতা। দুটো নমুনা দিচ্ছি-

১। (কবিতাটির নাম "কাজের সময়" রচনা ৭/১/৪০বাং)

দ্বীপ নিভিয়ে গেলে আর লাভ কি আছে তৈল দানে?

চোর পালিয়ে গেলে আর লাভ কি আছে সাবধানে?

চলে গেলে জীবন পাখী বৈদ্য ডেকে হয় কি ফল?

ফল কি-রে বাঁধিলে আলী চলে গেলে ক্ষেতের জল?

সময় মত কর্ম কর রেখনা কখন ফেলিয়ে,

কর্ম বিফল হবে গেলে কাজের সময় চলিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। (কবিতাটির নাম "অর্থ" রচনা ৭/১/৪০ বাং)

অর্থের অভাবে লোক কেহ নহে কা'র

সুখের সংসার হয় দুঃখের সংসার।

মাতা করে নিন্দা আর পিতা হল রুষ্ঠ।

দাস-দাসী ক্রুদ্ধ হয় ভ্রাতা হনু দুষ্ট।

সন্তান অবাধ্য হয় না লয় বচন।

প্রিয়সী রমনী করে রুক্ষ সম্ভাষন।

আত্মীয় কুটুম্বগণ নিকটে না যায়

কেননা নিকটে গেলে যদি কিছু চায়?"

স্কুলে শিক্ষকতা করবার সময় ছাত্রদের অনুরোধে তাদের মেজাজ-চরিত্র ও রুচি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে ছোট ছোট কবিতা লেখে দিতাম। ছাত্ররা ও গুলো মুখস্থ করত ও উৎসাহের সহিত আওড়াত। কবিতা গুলোর প্রতি ছাত্ররা বেশী রকম আকৃষ্ট হয় এ জন্য যে, ওর প্রতি চরণের নির্দিষ্ট একটা বর্ণ ওপর হতে নীচে যোগ করে পড়লে প্রার্থী ছাত্রটির নাম পাওয়া যেত। দুটো নমুনা দিচ্ছি-

AMARBOI.COM

১। (কবিতাটির নাম "উপদেশ" রচনা ১/৬/৩৯ বাং)

হাতে, মুখে, কাজে যেন থাকে এক যোগ।

সহসা না হয় যেন 'কটুভাষী' রোগ।

মন দিয়ে লেখা পড়া করিও যতনে।

তৎপর থাকিও মাতা পিতার বচনে।

আদরে তুষিও তব প্রিত বন্ধু গনে।

লিখিত রচন গুলো রেখ সদা মনে।

(কোন শব্দের আদ্যাক্ষর "নী" দুষ্প্রাপ্য)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। (কবিতাটির নাম "রূপ ও গুণ" রচনা ৫/৬/৩৯ বাং)

মুখের শ্রী চোখের শ্রী বৃথা অহঙ্কার।

সে অধম রূপবান গুণ নাই যার।

শত জন রূপবান এক গুনবান।

দুহাজার তারা যেন এক গোটা চান (চাঁদ)।

পুঞ্জ-পুঞ্জ তারকারা অন্ধকারে হাসে

কত জন থাকে তার বিধু যদি আসে?

কবিতাগুলো একত্র করে সাজিয়ে গুছিয়ে এক খানা খাতায় লিখতে এ সময় আমার ইচ্ছে হল, লেখা শুরু করলাম এবং শেষ করলাম ১৩৪০ সালের ১৫ই চৈত্র তারিখে। খাতাটার নাম রাখলাম "সীজের ফুল" ('সীজ" একটি গাছের নাম। অঞ্চল বিশেষে উহাকে "সেউজ" গাছও বলা হয়। এ গাছটির- চেহারা কদর্য, রস বিষাক্ত; বিশেষত: কখনো ফুল ধরে না। বলা যায় এটা একটা নির্গুন উদ্ভিদ। লেখক নিজেকে ঐ গাছটির সহিত তুলনা করে তার রচিত কবিতা (=পদ্ম=ফুল) গুলোর নাম রেখেছে "সীজের ফুল" (অর্থাৎ নির্গুনীর কবিতা)

এ সময় আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ফজলুর রহমান (আঃ রহিম মৃধার পুত্র) ছাড়া উচ্চ শিক্ষিত লোক অপর কেউ ছিল না। তাই সীজের ফুল এর পাণ্ডুলিপি খানা ভ্রমাদি সংশোধনের জন্য ফজলু মিঞার কাছে দিলাম। তখন তার একজন সহপাঠী বন্ধু ছিলেন মোঃ কোব্বাত আলী মিঞা (চাঁদপুর নিবাসী আনরদ্দিন শরীফের পুত্র)। তিনি ফজলু মিঞার নিকট চেয়ে (আমার সম্মতি নিয়ে) পাণ্ডুলিপি খানা পড়তে নিয়ে আর ফেরত দেননি।

গত হল প্রায় তেইশ বছর। ১৩৬৩ সালে মনে পড়ল সেই পাণ্ডুলিপি খানার কথা, কবিতা গুলোর কথা। আর একখানা পাণ্ডুলিপি তৈরী করা যায়-কি না, তা চেষ্টা করে দেখবার ইচ্ছে হল এবং সচেষ্ট হলাম। অনেক খোঁজাখুজি করে উহার কিছু সংখ্যক কবিতার টুকরো কাগজ পাওয়া গেল অনেকগুলোই পাওয়া গেল না। যেগুলো পাওয়া গেল, সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে আবার একখানা খাতায় লিখতে শুরু করলাম এবং লেখা শেষ করলাম ১৯শে ভাদ্র (১৩৬৩) তারিখে। এ খাতাখানায়ে "অভিনন্দন পত্র" নামে একটা কবিতা গুচ্ছ যোগ করা হ'ল, যা আগের খাতাটিতে ছিল না। পদ্ম ছন্দে লিখিত এ অভিনন্দন পত্রটি প্রদান করা হচ্ছিল লাখুটিয়ার জমিদার বাবু সুরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীকে, তার আঃ রহিম মৃধা সাবের বাড়ীতে আগমন উপলক্ষে। "সীজের ফুল" এর প্রায় সমস্ত কবিতাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ সালের রচিত। কিন্তু "অভিনন্দন পত্র"টির রচনাকাল ১৬ই বৈশাখ, ১৩৪৩।

শেষোক্ত পাণ্ডুলিপি খানা আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। কিন্তু উহা প্রকাশের চেষ্টা কখনো করিনি। যেহেতু- কবিতাগুলোর রচনা রীতি সেকেলে, ভাব, ভাষা ও ছন্দ, এর কোনটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রুটিমুক্ত নয়। বিশেষতঃ উহা কাব্যরসের অভাব হেতু কাব্যামোদী সমাজে সমাদৃত হবে না বলে আমার মনে হয়।

বিশ্বাসের বিবর্তন

(১৩৪১)

সাধু-সজ্জনরা বলেন যে, জগত অনিত্য। অর্থাৎ জগত বা জগতের মধ্যে "চিরস্থায়ী" বলে কিছুই নেই। আর বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে পরিবর্তন বা বিবর্তন। বিবর্তনের মাধ্যমে চলেছে পুরাতনের ঝাড়া-ছাটা, হচ্ছে নিত্যনূতনের আবির্ভাব, জগত চলেছে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে। মানুষের মনের বিশ্বাস (ঈমান)টাও পরিবর্তনশীল। আশৈশব একই বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখা চলে না। যদি কেহ রাখতে পারেন তিনি ত মানুষের মত মানুষ। কিন্তু আমি পারিনি।

শৈশবে মা বলেছেন যে, পুকুরে কুমীর, বাগানে বাঘ ও কবরখোলায় ভূত থাকে, ও সব জায়গায় যেও না। উহা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু ছেলে বয়সে করিনি। তখন বুঝেছি যে, ও সব মিথ্যে কথা। যেহেতু তখন (প্রথম বড়দের সাথে পরে একা একা) ওসব জায়গায় হামেসা গিয়েছি। কিন্তু দেখতে পাইনি ও সব কিছুই।

কৈশোরে নানাবিধ রূপকথা-উপকথায় বিশ্বাস করতাম। যখন শোনতাম- "হাজার মনের গদা নিল ভীমসেন, আশিমণ খানা খায় সোনাবান বিবি" ইত্যাদি। তখন উহা বিশ্বাস করতাম এবং মনে মনে বলতাম- "বাপরে কি সাধ্য ছিল ওদের! আর আমরা এখন কোথায়"? এভাবে চলতে থাকলে একদা- "বেগুন তলায় হাট মেলবে," তাও বিশ্বাস করতাম। কিন্তু যৌবনে ওসব বিশ্বাস করিনি, তখন মনে করেছি- "ধ্যোৎ, ওসব বাজে কথা, কথকের কল্পনা সৃষ্টি।"

যৌবনে বিশ্বাস রেখেছি ধর্মীয় আখ্যানগুলোর ওপর। যথা- গনেশের গজ মুন্ড রাবনের দশমুন্ড, ঈসা নবী খোদার ছেলে, খোয়াজখেজের (আঃ) জলে বাস করেন ইত্যাদি। বিশ্বাস করেছি- যেহেতু এগুলো ধর্মগ্রন্থের অনুমোদন প্রাপ্ত, বিশ্বাস করতেই হবে। তাই পুথিগানের আসরে ওগুলোকে নিয়ে নানা সুরে কীর্তন করছি।

হিন্দু, মুসলিম ও খৃষ্টানাদির ধর্মোপখ্যানগুলো পড়ে পড়ে আমার মনে কতিপয় ধাঁধার সৃষ্টি হচ্ছিল। কেননা ওতে এমন কতগুলো কাহিনী আছে, বিশেষতঃ প্রকৃতি সম্বন্ধে; যা একান্তই অবাস্তব। তবে বাস্তবের সন্ধান না পেলে অবাস্তবকেই আঁকড়ে থাকতে হয়। কিন্তু তাতে বিশ্বাসটা অনাবিল হয় না, কিছু সন্দেহের আবিল মিশ্রিত থাকে। দিন-রাত, জোয়ার-ভাটা, শীত-গ্রীষ্ম, বজ্র-বৃষ্টি ইত্যাদি এবং এজাতের আরো বহু বিষয় আছে, যা আমার ধাঁধার অন্তর্গত।

১৩৩৫ সালের শেষার্দ্ধ হ'তে আমি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক গুলো নিয়মিত অধ্যয়ন করে এ বছর এসেছি দশম শ্রেনীর পাঠ্যে। পাঠ্য গুলোর যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষন করেছে বিজ্ঞান, বিশেষতঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান। ও সব পড়ে ওতে আমার অনেক গুলো ধাঁধাঁর সমাধান পেলাম, কিন্তু তা ধর্মীয় মতের বিপরীত, বাস্তব মুখী।

আমার মন যেন বিজ্ঞানের সমাধান মেনে নিতে চাইল। বস্তুত ঃ-"চাইল" না, "বাধা হল"। মন তার নিজের গরজে বা সখ করে অথবা খাম খেয়ালী রূপে কোন কিছু বিশ্বাস করে না, করতে পারে না। বিশ্বাস্য বিষয়টি যুক্তির সাহায্যে চেপে ধরে মনকে তা বিশ্বাস করায়। এ ছাড়া আর এক ধরনের সহজ বিশ্বাস আছে, তাকে বলা হয় "অন্ধ বিশ্বাস", ওতে কোন যুক্তি-তর্কের বালাই নেই। আমার মন হল যুক্তিনির্ভর বিশ্বাসে বিশ্বাসী। নানাবিধ সমাস্যার সমাধানে যুক্তিভিত্তিক সমাধান সমূহ আমার মনোপূত হচ্ছিল। তাই ক্রমে আমি হয়ে ওঠলাম যুক্তিবাদী।

শিশুরা সাধারনতঃ মাকেই ভাল বাসে। কিন্তু এমন মা-ও আছেন, যিনি উগ্র স্বভাবী, রুক্ষ ভাষী ও অলস প্রকৃতি; সর্বদা রাগিয়াই থাকে। শিশু হয়ত মলত্যাগ করে বকুনী খায়, দুধ চেয়ে খায় চড়। এমতাবস্থায় শিশু দাদা-দাদী, ভাই-বোন বা অন্য কাউকে ভাল বাসে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিশুকে সর্বদা তুষ্ঠ রাখে, তাকেই ভালবাসে। আমার অন্তরের আকাঙ্খা পূরণ বা মনের খোরাকী দান করেছে ও করছে বিজ্ঞান। তাই আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, বিজ্ঞানকে ভালবাসী, ভালবাসী- যে কোন যন্ত্রপাতি দেখতে বোঝতে, কোন আবিষ্কার কাহিনী শোনতে ও পড়তে, নিজ হাতে কলকব্জা গড়তে।

AMARBOI.COM

ডাইনামো তৈয়ার

(১৩৪১)

চর বাড়ীয়া নিবাসী মুন্সি মোবাক্কার উদ্দিন নামক আমার এক বন্ধুর কাছে এক খানা বই পেলাম। বই খানা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের, নাম "গাছ পালা", লেখক বিজ্ঞানাচার্য জগদানন্দ রায়। কিছু দিন পড়বার জন্য বই খানা নিয়ে এলাম এবং দিনে-রাতে বই খানা পড়া শেষ করলাম। উদ্ভিদ জগতের বিজ্ঞান ভিত্তিক কিছু কিছু তত্ত্ব পাঠ্য বইয়ে আগে পড়েছি, এরূপ ধারাবাহিক ভাবে বিস্তৃত বিবরণ আর কখনো পড়িনি। বই খানা পড়ে আমার মনে হল যে, উদ্ভিদ জগতের তত্ত্ব জানতে আর যেন কিছু বাকি নেই। কিন্তু সমস্ত বইখানা পড়ে আমার যে লাভ হল, তার চেয়ে বেশী লাভ হল শেষের অতিরিক্ত পাতাটি পড়ে। ওখানে ছিল গ্রন্থকারের প্রণীত আরো কতিপয় বইয়ের তালিকা।

মানুষের নামের সাথে প্রায়ই চেহারা চরিত্রের মিল থাকে না। লালচাঁদ কালো এবং কালাচাঁদ সুন্দর হতে পারে এবং "সুধীর" নামের ব্যক্তিও চঞ্চল হতে পারে। কিন্তু বই পুথির নামের সাথে উহার চরিত্রের অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের মিল প্রায়ই থাকে।

এমন অনেক বিষয় আছে, যা জানবার জন্য আমি একান্তই আগ্রহী, অথচ তার ছিটে ফোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবরণ ছাড়া পাঠ্য পুস্তকাদিতে আশানুরূপ কিছু জানতে পাইনি। সেই সবের মধ্যে এক একটি বিষয় নিয়ে এক একখানা বইয়ের নাম দেখে আমি হর্ষোৎফুল্ল হলাম এবং তালিকাটি থেকে আমার ইপ্সিত কয়েক খানা বই নির্বাচন করলাম। যথা- গ্রহ-নক্ষত্র, পোকা-মাকড়, শব্দ, আলো, তাপ, চুম্বক, স্থির বিদ্যুৎ, চল বিদ্যুৎ, পাখী, মাছ, ব্যাং, সাপ ইত্যাদি। বই গুলোর প্রাপ্তিস্তান- ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ, ২২/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

অবিলম্বে আমি উক্ত ঠিকানায় একখানা চিঠি লেখলাম বই গুলো পাঠাবার জন্য কিন্তু "বইয়ের মূল্য বাবদ কিছু অগ্রিম পাঠানো হল না" বলে নিশ্চিত হলাম না। তথাপি দিন দশের মধ্যে একটি ভি, পি এলো, দাবী তের টাকা। টাকা দিয়ে পার্সেলটি রেখে দিলাম (১৮/৭/৩৮) এবং খেয়ে না খেয়ে বই গুলো পড়তে শুরু করলাম।

আমার একটি স্বভাব হচ্ছে এই যে, কোন নূতন বই হাতে পেলে, ওটা পড়ে শেষ না করা অবধি আমার স্বস্তি থাকে না, অন্য কাজে মন বসে না। পড়তে শুরু করলে - আহারের সময় পেরিয়ে যায়, চক্ষে ঘুম আসে না, অন্য কাজের কথা স্মরণ থাকে না; মুখেতে সিগারেট থাকে নিভে। বই গুলো পড়ে শুধু শেষ করলাম না-কতগুলো পড়লাম কয়েকবার; চুম্বক, স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ পড়লাম বহুবার এবং গ্রহ-নক্ষত্র খানাকে করলাম জীবন সঙ্গী।

বাংলা ভাষায়ে -কঠিন ও প্যাচানো বিষয় সমূহের এতাধিক সরল ও রসালো বর্ণনা আচার্য গেদানন্দ রায়ের লেখা ভিন্ন আমি আর কোথায়ও দেখিনি। কবি সম্রাটের "গ্রান তত্ত্ব" ও "বিশ্ব পরিচয়" নামক গ্রন্থদ্বয়ও সরল ভাষায় রচিত। কিন্তু রায় সাহেবের এ বই গুলোর মত রসালো নয়। বই গুলো পড়ে মনে হয় যেন গল্পের বই পড়ছি। রায় সাহেব পরিবেশন করেছেন ছোটদের ভোজ্য। কিন্তু ইহা ভোজনে তৃপ্ত হন বড়রাও।

বিজ্ঞান জগতের যাবতীয় আবিস্কৃত পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ এবং ব্যাপক ব্যবহার্য পদার্থ। শহরে, বন্দরে, পল্লীতে, নদীতে সর্বত্র -কোন না কোন রূপে এর ব্যবহার চলছে অহর্নিশ। রায় সাহেবের "চল বিদ্যুৎ" নামক বইখানা আমাকে প্রেরণা দিল নিজ হাতে বিদ্যুৎ তৈরী করবার এবং সে জন্য আমি সচেষ্ট হলাম।

১১/৬/৮১ বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল প্রণালী দুটি - রাসায়নিক ও যান্ত্রিক। রাসায়নিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সহজ, কিন্তু ইহাতে বিদ্যুৎ হয় - পরিমাণে অল্প ও ক্ষণস্থায়ী। আর যান্ত্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে হাঙ্গামা অনেক। কিন্তু এতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ হয় - পরিমাণে বেশী এবং দীর্ঘ স্থায়ী।

প্রথমে আমি রাসায়নিক বিদ্যুৎ তৈরীর জন্য মনোযোগী হলাম। তামা, দস্তা ও সালফিউরিক সংগ্রহ করলাম। সাত ভাগ পানি ও এক ভাগ এসিড মিশিয়ে একটি গ্লাসে রেখে তন্মধ্যে ডুবালাম একটি তামা ও একটি দস্তার দণ্ড। ফুট খানেক লম্বা দুটি তামার তারের দুপ্রান্ত যুক্ত করলাম তামা ও দস্তার দন্ডের মাথার সঙ্গে এবং অপর দুপ্রান্ত যোগ করলাম - একটি টর্চের ব্যাটারীর - ধণাত্বক ও ঋণাত্বক প্রান্তে। এতে বালবটি জ্বলে উঠল। কিন্তু আলো হল অতিক্ষীন ও লালচে এবং থাকল দু এক মিনিট মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রটিকে বলা হয় "ডাইনামো"। উহা তৈয়ারে হাঙ্গামা থাকলে ও মোটামোটি সহজ। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল সূত্রটি হল - চুম্বকের বলরেখা বা বলক্ষেত্রের মধ্যে কোন বেষ্টনী বা কয়েল ঘুরালে কয়েলের তারে বিদ্যুৎ জন্মে। কয়েলের তারের প্যাচের সংখ্যা ও ঘুর্ণনের মাত্রা যত বাড়ানো যায়, তারের বিদ্যুতের পরিমান তত বাড়ে।

লোহাকে চুম্বকে পরিনত করা কঠিন কাজ নয়। চুম্বক অনেক বানিয়েছি ও তদ্বারা কম্পাস (দিগদর্শন যন্ত্র) তৈরী করেছি। কয়েল তৈরীতেও তেমন কোন হাঙ্গামা নেই। প্রধান সমস্যা হল কয়েলটাকে ঘুরানো নিয়ে। তা হাতের বা পায়ের সাহায্যেও ঘুরানো চলে। আমি সেলাইয়ের মেশিনের ন্যায় পায়ে চালানো একটা ডাইনামো যন্ত্র বানাবার পরিকল্পনা করলাম। বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্য আমার এই নয় যে, ওর দ্বারা বাতি জ্বালিয়ে বাড়ী আলোকিত করব বা পাখা চালিয়ে বাতাস খাব। আমার উদ্দেশ্য হল নিজ হাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌতুহল নিবৃত্তি করা।

আর্মেচার ও চুম্বক বানাবার জন্য লোহা এবং কমিউটেটর বানাবার জন্য পিতল সংগ্রহ করলাম। কিন্তু কয়েল বা বেষ্টনীর জন্য তামার তার সংগ্রহে পেলাম বাধা। অনেক খোঁজ করেও বরিশালে ১০০ ফুটের বেশী তামার তার পেলাম না। বেষ্টনীর তার ইনসুলেট করার জন্য পীচ্ ও আলকাতরা কিনে নিলাম। লোহা ও পিতল- কাটা ও ফুটো করার জন্য ছেনী ও ক্যাছলা সংগ্রহ করে কাজ শুরু করলাম।

কোন লৌহ দণ্ডের উপর ইনসুলেট (কোন অপরিচালক পদার্থের দ্বারা তার আবৃত করা) করা তামার তার জড়িয়ে ঐ তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে লৌহ দন্ডটি চুম্বকে পরিণত হয় এবং ওটাকে বাঁকিয়ে (ঘোড়ার পায়ের নালের মত) প্রান্তদ্বয় কাছাকাছি আনলে, প্রান্তদ্বয়ের ফাঁকে চুম্বকের বলক্ষেত্র তৈরী হয়। ঐ বলক্ষেত্রে রেখে কয়েল বা আর্মেচার ঘুরালে আর্মেচারের তারে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিখারীর আত্মকাহিনী

তৃতীয় খন্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরোক্ত সূত্র ধরে আমি - একটি বাঁকানো কোমল লোহার গায়ে তামার তার জড়িয়ে একটি ম্যাগনেট (চুম্বক) বানালাম, একটি কোমল লোহার চাকার গায়ে (দশ প্যাঁচের তের দফে) তামার তার জড়িয়ে একটি আর্মেচার বানালাম, বানালাম - কমিউটেটর, ব্রস ইত্যাদি সবই। কাঠের দ্বারা একটা "চড়কা যন্ত্র" বানালাম, যার সাহায্যে চড়কার টাকু ঘোরাবার মত আর্মেচারটিকে ঘোড়ানো যায়। চড়কা যন্ত্রটি যা'তে কখনো বেশী আবার কখনো কম না ঘোরে, সে জন্য ওর সঙ্গে একটা ফ্লাই হুইল যুক্ত করলাম। অলটারনেট কারেন্টকে ডাইরেক্ট কারেন্টে পরিণত করার জন্য একটা কমিউটেটর ও এক জোড়া ব্রস বানালাম এবং ব্রস দুটো হতে বাইরে নিলাম দুটো তার। এই তার দুটোর মধ্যে টর্চের বালবের নিগেটিভ ও পজিটিভ প্রান্তে যোগ করলে বালবটি জ্বলবার কথা।

ডাইনামো ও তার পরিচালক চড়কা যন্ত্রটি এমনভাবে স্থাপন করলাম যে, সিঙ্গার মেশিনের মত পাদানীতে পা রেখে চাপ দিলে যেন চড়কা যন্ত্রটি (ফ্লাই হুইলসহ) ঘোরতে থাকে এবং এর একটি চাকার সঙ্গে বেল্টের সাহায্যে আর্মেচারটি যুক্ত থাকায় আর্মেচার ও কমিউটেটর ঘোরতে থাকে। কমিউটেটরের সহিত ব্রসের ও ব্রসের সহিত তারের মাধ্যমে বালবের যোগ আছে। যন্ত্রটি পরিচালিত করলে আর্মেচারে যে অলটারনেট কারেন্ট জন্ম হবে তা, কমিউটেটরে গিয়ে ডাইরেক্ট কারেন্টে পরিণত হয়ে ব্রস সংলগ্ন তার বেয়ে বালবে গিয়ে উহাকে জ্বালাবে। সব ঠিকঠাক করে ডাইনামো যন্ত্রটি বানাতে প্রায় দুমাস কেটে গেল।

৯ই কার্তিক (১৩৪১) আনুষ্ঠানিকভাবে আমি আমার তৈরী ডাইনামো যন্ত্রটি পরিচালনা করলাম। যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশই আশানুরূপ কাজ করল। কিন্তু বিদ্যুৎ জন্মিল মাত্র দুভোল্ট। বিদ্যুৎবাহী তারের সহিত একটি বালব যোগ করা হলে, সেটি জ্বলে ওঠল। কিন্তু উহা লালচে বর্ণ ধারণ করল মাত্র, সাদা হয়ে আলো প্রদানে সক্ষম হ'ল না।

এ যন্ত্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করবার তিনটি উপায় আছে। যথা - (১) আর্মেচারের ঘুর্ণনের মাত্রা বৃদ্ধি করা। (২) আর্মেচারের গায়ে জড়ানো তারের প্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। (৩) ম্যাগ্নেটের গায়ে জড়ানো তারের প্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরোক্ত তিনটি উপায়ের মধ্যে প্রথম উপায়টি কার্যকরী করা ইঞ্জিনচালিত ডাইনামো যন্ত্রে সম্ভব, কায়িক শক্তিতে চালিত যন্ত্রে সম্ভব নয়। কেননা কায়িক শক্তি সীমাবদ্ধ শক্তি। হস্ত বা পদ চালিত যন্ত্রে আর্মেচারের ঘুর্ণনবেগ সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় অবলম্বন করতে হলে তামার তার বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও অতিরিক্ত তামার তার সংগ্রহ করতে না পারায় এ যন্ত্রটির আর উন্নতি করা সম্ভব হল না। মূলতঃ ডাইনামো যন্ত্রটি বানাবার আমার আসল উদ্দেশ্য- নতুন কিছু উদ্ভাবন করা নয়, নিজ হাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার কৌতুহল নিবৃত্তি করা।

কৃষি বিদ্যা শিক্ষা

(১৩৪১-১৩৬৬)

হৃদরোগে ভুগে কৃষিকাজ ত্যাগ করার প্রায় সাত বছর পর ১৩৪১ সালের ১৬ই কার্তিক লাঙ্গল-জোয়াল-গরু নিয়ে আবার মাঠে নামলাম। সঙ্গীত কিছু কিছু রবি ফসলের আবাদ করলাম, ক্রমে অন্যান্য। ১৩৪২ সালের কার্তিক মাসে কিছু পরিমাণ জমিতে নৈনিতাল আলুর চাষ করলাম। ফলন পেলাম অতি ভাল। মনে পড়ে এ অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে গোল আলুর চাষ এই-ই প্রথম।

অত্যাধিক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে পাটের মূল্য হ্রাসের দরুন- চাষীদের পাটচাষ কমাইবার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ এ সময় গ্রামে গ্রামে প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন। ১৯শে ফাল্গুন (১৩৪২) মাননীয় এস,ডি,ও সাহেব, সি,ও মাননীয় আমীর আলী সাহেব, জনৈক কৃষি কর্মচারী ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসলেন আমাদের গ্রামে, সভা ডাকলেন কাছাড়ী বাড়ীতে। গ্রামের চাষিদের নিমন্ত্রণ ছিল, বহুলোক উপস্থিত হলেন। সভায় অনেকে বক্তৃতা করলেন। সকলের সকল বক্তৃতার সারমর্ম হল- পাটের চাষ কমিয়ে খাদ্য শষ্যের চাষ বাড়ানো। শুনে কোন কোন চাষি বল্লেন যে, পাট ছাড়া আমাদের জমিতে অন্য ফসল ভাল জন্মে না। আবার কেহ- আমাকে নির্দেশ করে বল্লেন- মাতুব্বর সাবের জমিতে এ বছর অতি উত্তম আলু জন্মেছে। ইহা শুনে এস.ডি ও সাহেব আমার কাছে সেই আলুর নমুনা দেখতে চাইলেন এবং আমি বাড়ী হতে নিয়ে তাঁকে দশটি আলু দেখতে উপহার দিলাম। আমার ক্ষেতের জন্মানো আলু দেখে সবাই আনন্দিত হলেন। কেননা আলু দশটি ওজনে ছিল আড়াই সের।

এস.ডি.ও সাহেবকে বললাম যে, আমি গতানুগতিক পন্থায় পেশাদারী কৃষিকাজ করতে শিখেছি মাত্র, কৃষিবিদ্যা শেখার কোন সুযোগ পাইনি কখনো। আধুনিক পদ্ধতিতে নিত্য-নূতন ফসল জন্মাতে আমি আগ্রহী। এন,জি মুখার্জী কৃত "সরল কৃষি বিজ্ঞান" ও "কৃষি সহায়" নামক দুখানা বই এনেছিলাম আমি বিগত ১১/৯/৪১ তারিখে কৃষক অফিস ৬৩নং বহুবাজার স্ট্রিট কলিকাতা হতে পার্শেল করায়ে। ঐ বই দুখানার সহায়তায় আমার বর্তমান কৃষি পদ্ধতি কিছুটা উন্নত মানের হচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ পেলে আমি কৃষি উন্নয়নে ব্রতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতাম। শুনে এস,ডি,ও সাহেব উপস্থিত কৃষি কর্মচারীটিকে অনুরোধ করে বল্লেন যে, তিনি যেন বরিশাল কৃষি অফিস এবং সাগরদী কৃষি ফারম হতে এ বিষয় আমাকে যথা সম্ভব সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। কৃষি কর্মচারীটি সম্মতি জানালেন।

অতঃপর আমি বরিশাল কৃষি অফিসের সাথে সংযোগ রেখে চলতে লাগলাম। কৃষি অফিসের মারফতে- "কৃষক" নামক (তদানিন্তন) একখানা কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা বিনামূল্যে আমি যাতে পেতে পারি, তার ব্যবস্থা করা হ'ল। ১৩৪৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা হ'তে নিয়মিতভাবে আমি মাসিক "কৃষক" পত্রিকা খানি পেতে লাগলাম।

ক্রমে আমি বরিশাল কৃষি অফিস হতে নিম্ন লিখিত পুস্তিকাগুলো পেলাম -

(১) গোপাল বান্ধব ---- পি,সি, সরকার

(২) সজীচাষ ---- এন,সি, চৌধুরী

(৩) কৃষি ক্ষেত্র ---- পি.সি. দে

(৪) সজীবাগ ----- পি.সি. দে

(৫) ভূমি কর্ষণ ---- পি.সি. দে

(৬) উদ্ভিদ জীবন ---- পি.সি. দে

(৭) গো-সেবা ----- জে, আর, মজুমদার

(৮) বাংলার মাটি --- জে, আর, মজুমদার

(৯) সরল কৃষি কথা --- জে, আর, মজুমদার

(১০) ফসলের খাদ্য --- জে, আর, মজুমদার

(১১) মৎস্য বিজ্ঞান --- জে, আর, মজুমদার

(১২) আলুর চাষ --- জে, আর, মজুমদার

(১৩) কলার চাষ --- জে, আর, মজুমদার

(১৪) ইক্ষু চাষ --- জে, আর, মজুমদার

(১৫) পান চাষ --- জে, আর, মজুমদার

কোন নতুন বই পুথি হাতে পেলে, তা একবার পড়ে দেখার আগ্রহটা থাকে প্রত্যেক পাঠকের, আমারও আছে। প্রত্যেকটি পুস্তক পাঠে কিছু না কিছু লাভবান হওয়া যায়। গল্প, উপন্যাসাদি সাহিত্য শ্রেণীর পুস্তক পাঠে প্রথমতঃ আনন্দ লাভ হয়, দ্বিতীয়তঃ ওতে নৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র উন্নয়নের উপকরণ পাওয়া যায়। তবুও ওসবের প্রতি আমার মনের আকর্ষন ততটা বেশী নয়, যতটা বিজ্ঞানের প্রতি। বিজ্ঞানের পুথিতে বর্ণিত সাধারণ বিষয়গুলো হাতে নাতে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করে দেখায় আমার একটা আনন্দ।

তাই আমি "চুম্বক" (বই) পড়ে চুম্বক (লোহা) গড়ে কম্পাস বানিয়েছি, "চলবিদ্যুৎ" পড়ে ব্যাটারী ও ডাইনামো বানিয়েছি এবং "গ্রহ-নক্ষত্র" বই খানা পড়ে আকাশের - রাশি, নক্ষত্র, গ্রহ এবং অন্যান্য নক্ষত্র যথা- কালপুরুষ, সপ্তর্ষি, পারসুস, পেগাসস, ধ্রুব, ক্যাসোপিয়া, এন্ড্রোমিডা, ক্যাপেলা, লুব্ধক, সরমা ইত্যাদি রাতের পর রাত জাগিয়ে আকাশে খোঁজ করেছি, খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি, কতগুলো হয়ত চিনেছি। এভাবে ক্রমাগত তিন বছর যাবত আমি আকাশ চাষ করেছি এবং এ বছর আবার শুরু করেছি বিজ্ঞান ভিত্তিক জমিনের চাষ। হয়ত কেহ প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমার মত একজন কৃষকের পক্ষে আকাশ চাষে লাভ কি? উত্তরে বলব - আর্থিক লাভ আমার কিছুই হয়নি, তবে আত্মিক লাভ হয়েছে যথেষ্ট। এ বিষয় অন্য সময় বলব।

কৃষি সংক্রান্ত বইগুলো পেয়ে ওর উপদেশ ও নিয়ম মাফিক - প্রথমতঃ পরীক্ষামূলক এবং পরে কার্যকরীভাবে কৃষি কাজ করতে লাগলাম। সচরাচর আমাদের এ অঞ্চলে - ধান, পাট, আখ, তিল, শরিষা, মুগ, মশুরী, খেসারী, মরিচ, পিয়াজ, রসুন, ধনিয়া, মানকচু, মূলা, ফুটী, খেরো, তরমুজ, কুমরা ইত্যাদি ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে এবং আমিও এগুলো সাধারণ ভাবে আবাদ করেছি। এ ছাড়া আমি আরো কতিপয় ফসলের চাষ করেছি, যা সে সময় অন্য কেহ করেননি। যথা- আলু, গম, তিসি, চিনাবাদাম, হরিদ্রা, শন, কোয়েম্বাটুর (৪২১ ও ৫২৭) ইক্ষু, পান ইত্যাদি। এ ভাবে কৃষি কাজ চালালাম ১৩৬৬ সাল পর্যন্ত।

কৃষি বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট বিষয় হল এই যে, রসায়ন শাস্ত্রের নিয়মে একাধিক পদার্থের মিলনের ফলে একটি অভিনব পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমন - সোডিয়াম ও ক্লোরিন নামক দুটি পদার্থ যোগে "লবণ" এবং তামা, গন্ধক ও অক্সিজেন যোগে "তুঁতে" উৎপন্ন হয়। আবার হরিদ্রার সাথে চুন মিশালে উৎপন্ন হয় "লাল রং"। আমাদের কৃষি ক্ষেত্রটাও অনুরূপ একটি রাসায়নিক লীলা ভূমি। যেখানে একটি শুষ্ক বীজ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, -পরিমিত জল প্রয়োগে সেখানে দেখা দেয় একটি "অঙ্কুর"। আবার জল, বায়ু, সূর্যালোক ও (মাটিস্থ) জৈবাজৈব কতগুলো পদার্থ যোগে অঙ্কুরটি পরিণত হয় একটি "বৃক্ষে"। কোন কোন পদার্থ বৃক্ষের পাতা, পল্লব বা ফুল বৃদ্ধির সহায়তা করে আবার কোন কোন পদার্থ মিশ্রিত হয়ে গাছের "খাদ্য" (সার) প্রস্তুত করে এবং কোন কোন পদার্থ করে (গাছের শত্রু) পোকা-মাকড় ধ্বংশ। এভাবে কৃষি ক্ষেত্রের সর্বত্রই চলছে রসায়ন বা দ্রব্যগুলির ব্যবহার। কৃষকরা ওসব না জানার জন্যই কৃষিজাত ফসলের তথা কৃষিকাজের উন্নতি হচ্ছে না; হচ্ছে অবনতিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলঘড়ী তৈয়ার

৭/৫

(১৩৪৩)

ঘড়ী সময় মাপার যন্ত্র। আগে লোকে সূর্যের গতি বা কোন কিছুর ছায়া দেখে বা মেপে সময় নিরুপণ করত। সাধু-সজ্জন বা মুনি-ঋষীরা জপমালার গোনাগুণতির দ্বারা সময়ের একটা স্থুল হিসাব পেতেন। আমাদের গ্রামের মুন্সি আপছার উদ্দিন সাহেব প্রত্যহ মাগরেবের নামাজের বাদে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক তছবিহ পড়ে এশার নামাজ পড়তেন। এতে তাঁর ঘড়ীর কাজ হ'ত। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে সুস্থ দেহে পূর্ণবয়স্ক একজন লোকের হৃদস্পন্দন বা নাড়ীর স্পন্দন এক মিনিটে ৭৫ বার এবং শ্বাস প্রশ্বাস ২০ বার। তা হলে একবার শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপ্তিকাল ৩ সেকেন্ড এবং এক একটা নাড়ীস্পন্দনের সময়সীমা ৪/৫ সেকেন্ড। এ হিসাবে প্রতি ঘন্টায় নাড়ীর স্পন্দন ৪৫০০ বার এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ১২০০ বার। বসে বসে নাড়ীর স্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাস গুণতে থাকলে, ওতেও সময়ের একটা হিসেব পাওয়া যায়। কিন্তু সকল রকম প্রচেষ্টার শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে "ঘড়ী"।

হাতের শক্তি স্প্রিং এ জমা রেখে তদ্বারা ঘড়ীর যন্ত্রাংশ চালিয়ে সময় মাপা হয়। অনেক দিন হতে আমি ভাসা ভাসা ভাবে ভাবতে ছিলাম যে, কোন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ঘড়ী চালানো যায় কি-না। কিছু দিন পর্যায়ক্রমে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করলাম যে, জলের মাধ্যাকর্ষণী শক্তির দ্বারা ঘড়ী চালানো সম্ভব। জলের দ্বারা ঘড়ী চালানো সম্বন্ধে আমার চিন্তা ধারাটা মোটামুটি এ রকম-

সুক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত কোন পাত্রে জল রাখলে, ছিদ্র দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে থাকবে। দুটি ফোঁটা পতনের মাঝের সময়ের ব্যবধান একই থাকবে- যদি ছিদ্রের পরিধি ও পাত্রের জলের উচ্চতা একই মাপের থাকে। পক্ষান্তরে - ছিদ্র বড় করলে বা জলের উচ্চতা বাড়ালে ফোটা তাড়াতাড়ি পড়বে এবং ছিদ্র ছোট করলে বা জলের উচ্চতা কমালে ফোঁটা ধীরে ধীরে পড়তে থাকবে। এই ফোটা পড়া থেকে দুটি উপায়ে সময়ের হিসাব পাওয়া সম্ভব। প্রথম উপায়টি হল - ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড ইত্যাদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের পতিত ফোটাগুলো গুণে বা মিনিম গ্লাসে ফেলে মেপে সময়ের একটা হিসেব পাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় উপায়টি হল - সাধারণতঃ জলের একটি ফোঁটার ওজন ১ গ্রেন বা প্রায় .৫ রতির সমান। কোন তৈল যন্ত্রের (সুক্ষ্ম মাপের নিক্তির) এক দিকের একটি বাটির ওপর একটি ফোটা ফেললে নিক্তির দন্ডের একটা দিক সামান্য নীচু হবে। ফলে অপর দিকটা সমপরিমাণ ওপরে ওঠবে। নিক্তি দন্ডের এই গতি অর্থাৎ ওঠা-নামা থেকে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ে নিক্তি দন্ডটা কতটুকু ওপরে ওঠল বা নীচে নামল, সে মাপের সূত্র ধরে সময়ের একটা হিসাব পাওয়া সম্ভব।

আমি দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন করে "জল-ঘড়ী" বানাবার জন্য একটা পরিকল্পনা করলাম এবং কাগজে ওর একটা নক্সা আঁকলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নক্সায় প্রদর্শিত ঘড়ীটির সব কিছুকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। যথা- পরিচালক অংশ ও পরিচালিত অংশ। আবার পরিচালক অংশকে "জলাংশ" এবং পরিচালিত অংশকে "যন্ত্রাংশ" বলা যায়। প্রথমতঃ আমি জলাংশ সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

জলাংশে তিনটি জলাধার থাকবে। এর ওপর ভাগে থাকবে প্রথম জলাধারটি এবং এর ওপরে থাকবে একটি মুখ। এটা দিয়ে ওপরের জলাধারটিতে জল ভরতে হবে। এজলাধারটির নিম্নভাগে একটি ছিদ্র ও নল, এটা দিয়ে জল নীচে পড়তে থাকবে। এ জলাধারটির নীচে স্থাপন করতে হবে আর একটি জলাধার। ওপরস্থিত প্রথম জলাধারটি হতে দ্বিতীয় জলাধার এ জল পড়তে থাকবে। এটার নীচেও একটি সুক্ষ্ম ছিদ্র থাকবে এবং তা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে থাকবে। প্রথম জলাধারের জল পড়ার সাথে সাথে তার জলের পরিমাণ বা উচ্চতা কমতে থাকবে। কিন্তু দ্বিতীয় জলাধারটির জল পড়ে তার জলের পরিমাণ বা উচ্চতা কমবে না, একই থাকবে। জলের উচ্চতা একই ভাবে রাখার উপায় হিসাবে এটার মধ্যের জলে একটি কৌটা ভাসমান রাখতে হবে এবং কৌটাটির ওপরে একটি নিয়ন্ত্রক শলা বসানো থাকবে। নিয়ন্ত্রক শলাটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যে, ওর দৈঘ্য বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। এর জন্য শলাটির ওপরে একমুখ খোলা একটি সরু চোঙ্গা বসাতে হবে। চোঙ্গাটির গর্তের ফাঁক এতটুকু হওয়া দরকার, যাতে ওর ভেতর পূর্বোক্ত শলাকাটী ঢোকানো যায় অথচ ঢিলা না হয়। অর্থাৎ আবশ্যক বোধে চোঙ্গাটির ভেতর শলাকাটী ঢুকিয়ে ও বের করে "চোঙ্গা-শলাটির দৈর্ঘ্য বাড়ানো বা কমানো যায়। চোঙ্গা-শলাকাযুক্ত ভাসমান কৌটাটি এমনভাবে জলের ওপর ভাসায়ে রাখতে হবে যে, চোঙ্গা-শলাটির ওপরপ্রান্ত প্রথম জলাধারটির ছিদ্র এর সোজা থাকে। প্রথম জলাধার হতে দ্বিতীয় জলাধারে জল পড়ে এর জলের উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোঙ্গা শলা সমেত কৌটাটি ভেসে ওপরে ওঠতে থাকবে। এতে এমন একটা সময় আসবে যখন চোঙ্গা শলাটির ওপর প্রান্ত- প্রথম জলাধারটির নীচের ছিদ্র কে বন্ধ করে দেবে। এতে প্রথম জলাধার হতে দ্বিতীয় জলাধারে আর জল আসতে পারবে না। তবে কখনো আসতে পারবে না, তা নয়; দ্বিতীয় জলাধার হতে তার নীচের ছিদ্র দিয়ে যেই পরিমাণ জল পড়বে, প্রথম জলাধার হতে দ্বিতীয় জলাধার এ সেই পরিমাণ জল আসতে পারবে, এর বেশী নয়। এতে দ্বিতীয় জলাধার এর জলের উচ্চতা সব সময় একইভাবে থেকে যাবে এবং এটা হতে তার নীচের ছিদ্র দিয়ে একই নিয়মে জলের ফোঁটা পড়তে থাকবে। কিন্তু চোঙ্গা-শলা এর দৈর্ঘ্য বাড়ালে দ্বিতীয় জলাধার এর জলের উচ্চতা কমে যাবে এবং তার ফলে ধীরে ধীরে ফোঁটা পড়বে আর দৈঘ্য কমালে জলের উচ্চতা বেড়ে যাবে, ফলে ফোটা পড়বে তাড়াতাড়ি।

ধীর বা দ্রুত - যেভাবেই জলের ফোঁটা পড়ুকনা কেন, দৈনিকে (২৪ ঘন্টার) পতিত জল জমা হবে গিয়ে সর্বনিম্নে স্থাপিত তৃতীয় জলাধার এ এবং শূন্য হবে প্রথম জলাধার। একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রথম জলাধার এ জল ভর্তি করতে হবে। কিন্তু সে জন্য বাইরে থেকে জল আনতে হবে না। তৃতীয় জলাধার এর নিম্ন পার্শ্বে এমন একটি পাম্পার যন্ত্র যুক্ত করতে হবে, যার হ্যান্ডেল টানলে তৃতীয় জলাধার হতে পাম্পের মধ্যে জল ঢোকে এবং চাপ দিলে প্রত্যাবর্তক নল বেয়ে ওপরে উঠে প্রথম জলাধারে চলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম জলাধারটিতে কি পরিমাণ জল থাকল বা আদৌ থাকল না, তা দেখার জন্য জলাধারটির নিম্নাংশের সঙ্গে একটি (কাঁচের) পরিমিতী নল যুক্ত করতে হবে। এতে বাইরে থেকে প্রথম জলাধারটির জল দেখে পাম্পারের সাহায্যে যথা সময়ে ওটাতে জল প্রদান করা সম্ভব হবে।

"পরিচালিত অংশ" বা যন্ত্রাংশের বিষয়ে এখন বলছি। এর "বাটি" ও "চক্র" একত্রে বলা যায়-"চক্র বাটি"।

জল ঘড়ী পরিচালনার মূল শক্তিটি- হল "মাধ্যাকর্ষন শক্তি" বা জলের "নিম্ন চাপ" শক্তি। এ শক্তি বাড়া-কমা নির্ভর করবে "চক্র-বাটির" চাকার "ব্যাস" ও বাটিতে পতিত "জলের" পরিমাণের ওপর। চক্রবাটির চাকার ব্যাস বাড়ালে ঐ চাপ শক্তি বাড়বে এবং ব্যাস কমালে চাপ শক্তি কমবে। কাজেই শক্তি বাড়াবার জন্যই চক্রবাটির চাকাটি কিছু বড় করতে হবে। আমার পরিকল্পিত চক্রবাটির চাকার ব্যাস হবে ১২ ইঞ্চি। তাই প্রথমতঃ- ১২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটি চাকা তৈরী করতে হবে এবং ওটায় প্রায় ব্যাসার্ধ পরিমাণ দৈর্ঘ্য বারোটি চক্রদণ্ড থাকবে। চক্রটির কেন্দ্রে থাকবে আড়াআড়ি ভাবে একটি দণ্ড, এটাকে বলা হবে শক্তিবাহী দণ্ড। শক্তি-বাহী দণ্ডটির এক প্রান্ত থাকবে ঘড়ীটির পিছনের দিকে কোন এক স্থানে আলগা ভাবে ধরানো এবং অপর প্রান্ত থাকবে ঘড়ীটির সম্মুখ ভাগে ডায়ালের মিনিটের কাটার সঙ্গে যুক্ত এবং উপরে থাকবে একটি নল পড়ানো, ওটাকে বলব "আহ্নিক নল"। চাকাটির পরিধিকে সমান বারো ভাগে বিভক্ত করে অর্থাৎ বারোটি চক্রদণ্ডের মাথায় বারোটি বাটি বসাতো হবে। এতে দুটি বাটির মধ্যকার ব্যবধান হবে ৩০০° ডিগ্রী। বিশেষতঃ ঘড়ীর সম্মুখে দাঁড়ানো দর্শকের ডান দিকের বাটির মুখ ওপরের দিকে থাকবে। পূর্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় জলাধার দুটি এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে, যেন দ্বিতীয় জলাধার হতে পতিত জলের ফোটা গুলো (ডান দিকের) সমতল বাটিটার ওপর পড়ে। এতে পতিত জলের ওজনে বা চাপে সমতল বাটিটা নিম্নগামী হবে এবং নিয়ন্ত্রক শলা বাড়িয়ে কমিয়ে জলের ফোটাগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যে, পাঁচ মিনিট সময়ে বাটিটা ৩০০° ডিগ্রী নীচে নেমে যায়। এতে সমতলের বাটিটা আর সমতলে থাকবে না। কিন্তু তার পেছনের বাটিটা সমতলে আসবে এবং জলের ফোটার চাপে ক্রমে সেটাও নীচে চলে যাবে, পূনঃ সমতলে আর একটা আসবে, পরে আর একটা। এভাবে শক্তিবাহী দন্ড সমেত বাটি-চক্রটা ঘুরতে থাকবে এবং এক ঘন্টা (৫x১২=৬০ মিনিট) পর প্রথম সমতল বাটিটা ঘুরে আবার সমতলে আসবে। অর্থাৎ বাটি চক্রটা ঘুরবে ঘন্টায় একবার। এভাবে চলতে থাকবে বাটি-চক্রের ঘূর্ণন। আর বাটি-চক্রের কেন্দ্রে সংলগ্ন শক্তিবাহী দন্ডটির সহিত ঘুরবে ডায়াল এর মিনিটের কাটাটি নিয়মিতভাবে।

শক্তিবাহী দন্ড এর সঙ্গে আর একটি দাঁতওয়ালা ছোট চাকা (পিনিয়ন) সংযুক্ত করতে হবে, তার নাম হবে "ঘন্টা-চক্র"। এই ঘন্টা-চক্রের দাঁতের সহিত দাঁত মিশিয়ে অনুরূপ আর একটি বড় চাকা স্থাপন করতে হবে, তার নাম হবে "আহ্নিক চক্র" এবং ওর পরিধি হবে ঘন্টা চক্রের বারো গুণ। এটার কেন্দ্র বিন্দুতে একটা আহ্নিক দন্ড থাকবে এবং তার এক প্রান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে আহ্নিক চক্রধারী দন্ড এর সঙ্গে আলগা ভাবে লাগানো ও অপর প্রান্ত থাকবে ঘড়ীর সম্মুখ ভাগের কোথায়ও আলগা ভাবে লাগানো। আহ্নিক চক্রটি ঘুরবে প্রতি বারো ঘন্টায় একবার।

ঘন্টা চক্র ও আহ্নিক চক্রের ব্যাসের সমষ্টির অর্ধেক ব্যাস বিশিষ্ট দাঁতওয়ালা দুটো চক্র তৈরী করতে হবে। ওদের বলা হবে "যুগ্ম আহ্নিক চক্র"। এর একটা চক্র থাকবে আহ্নিক দন্ডের সাথে যুক্ত এবং অপরটি থাকবে আহ্নিক নল এর সঙ্গে যুক্ত। বিশেষতঃ উভয় চক্রের দাঁতে দাঁত মিলানো থাকবে। আহ্নিক নলটি এর বাইরের দিকের শেষ প্রান্তে যুক্ত থাকবে (মিনিটের কাটার সাহায়ক রূপে) ঘন্টার কাটা।

ঘুর্ণনশীল সংযোগস্থানগুলো যথা সম্ভব আলগা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে জলের আবশ্যকতা কমে যাবে। পরিশ্রুত বা কলের জল ব্যবহার করতে হবে। নচেৎ জলাধারের ছিদ্র পথে ময়লা জমে জল পতন ব্যাহত হবে। ফলে ঘড়ীর নির্দিষ্ট সময়ের হেরফের হবে, হয়ত বা ঘড়ী বন্ধ হয়ে যাবে।

পরিকল্পিত ঘড়িটি (২৪ ঘন্টা) চালাতে যে পরিমাণ জল আবশ্যক হবে, তার বাস্তবতা নির্ভর করবে- প্রস্তুতকারকের পারদর্শিতা বা কলাকৌশলের সুক্ষ্মতার উপর। তবুও স্থুলতঃ একটা হিসাব করা যেতে পারে।

প্রতি দু সেকেন্ডে এক ফোটা করে জল খরচ হলে ২৪ ঘন্টায় জলের আবশ্যক হবে প্রায় দু সের তের ছটাক, ধরা যেতে পারে তিন সের। সুতরাং এই পরিমাণ জল ধারনের উপযোগী জলাধার আবশ্যক হবে।

জলাধার, বাটিচক্র ও পিনিয়ন সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ঘড়িটির ও তার অন্যান্য অংশের পরিমাপ হওয়া উচিত নিম্নরূপ।

১। ঘড়ির দেহ - দৈর্ঘ্য ১৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ৯ ইঞ্চি, উচ্চতা ২৪ ইঞ্চি।

২। জলাধার - দৈর্ঘ্য ১৪.৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮.৫ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ২ ইঞ্চি।

৩। জলাধার (গোলাকার ব্যাস ৩ ইঞ্চি, উচ্চতা ৩$^{৩}/_{৪}$) ইঞ্চি।

৪। ভাসমান কৌটা - (গোলাকার) ব্যাস ২$^{৩}/_{৪}$ ইঞ্চি, উচ্চতা $^{১}/_{৪}$ ইঞ্চি।

৫। নিয়ন্ত্রক শলা - (গোলাকার) (ওপরের চোঙ্গা অংশের) দৈর্ঘ্য ৩$^{১}/_{৪}$ ইঞ্চি, ব্যাস ইচ্ছাধীন, (নিম্নাংশের) দৈর্ঘ্য ৩$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি, ব্যাস ওপরের ব্যাসের গর্তের সমান।

৬। জলাধার - প্রথম জলাধার এর অনুরূপ।

৭। বাটি- (গোলাকার) ব্যাস ১ ইঞ্চি, উচ্চতা ১ ইঞ্চি।

ইহা ভিন্ন ঘড়ীটি নির্মাণে অন্যান্য যা কিছু আবশ্যক হবে, তা নির্মাণকারীর বিবেচনাধীন থাকিবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩২০-৪৫ সাল পর্যন্ত - মাধব পাশা নিবাসী মধুসুধন কর্মকার ও তাঁর পুত্র রসিক চন্দ্র কর্মকার আমাদের বাড়ীতে থেকে সোনা-রূপার কাজ করতেন। কিন্তু আবশ্যকবোধে তামা-পিতলের কাজ এবং কচিৎ লোহার কাজও করতেন। আমি সচরাচর দোকানের কাছে বসে বসে ওদের কাজ করা দেখতাম।

হাতের কাজ সমূহ "দেখা" ই "শেখা", অবশ্য মনোযোগের আবশ্যক। আর দেখা কাজ হাতে করতে করতেই অর্জিত হয় দক্ষতা ও নিপুণতা।

ওঁদের দোকানে বসার দুটি আসনে দুটি নেহাই ছিল এবং যে কেহ বাড়ীতে গেলে একটি নেহাই খালি পড়ে থাকত। আমি অবসর সময়ে ওখানে বসে তামা ও পিতলের ছোট খাট কাজ করবার সুযোগ পেতাম এবং কিছু কিছু কাজ করতাম। ওঁরাও আমার কর্মোৎসাহ দেখে এ কাজে আমাকে সহায়তা করতেন। বহু বছর যাবত ওঁদের সংস্রবে থেকে ও সহযোগিতা পেয়ে আমি তামা, পিতল ও লোহার কিছু ছোট ছোট কাজ করতে শিখতে পেরেছি। যেমন - হাতের আংটি, গেলাস বাটি, কুপীবাতি, শোন, সেঁড়া ইত্যাদি এবং বিশেষ ভাবে শিখেছিলাম - তামা, পিতল ও লোহা, টিন ইত্যাদির "ঝালাই" এর কাজ। (গার্হস্থ্য জীবনে টুকি-টাকি কাজ নিয়ে কর্মকার ঝালাইকারের কাছে গিয়ে আমাকে ধন্না দিতে হয় না। কেননা সাধারণ কাজ গুলো করবার মত হাতিয়ার আমি সংগ্রহ করে নিয়েছি এবং নিজের কাজগুলো নিজেই করে থাকি। এমন কি চুল কাটা, জুতা সেলাই ইত্যাদিও। এতে আমি "লজ্জাও" ও পয়সা কিছুই পাই না, পাই আনন্দ।)

আমার পরিকল্পিত ঘড়ীটি নির্মাণ করবার জন্য যে সমস্ত মাল-মশল্লা ও যন্ত্রপাতি আবশ্যক হতে পারে, সে সমস্ত সংগ্রহ ও রোপনাদি মাঠের কাজ আপাতত ঃ সমাধা করে ২৫ শে ভাদ্র (১৩৪৩) নিজ হাতে ঘড়ী নির্মাণের কাজ শুরু করলাম। ঘড়ীটি নির্মাণে আমার প্রায় দুমাস সময় কেটে গেল। ঘড়ীটিতে ব্যবহার করা হল- তামা, টিন, লোহা ও কাঠ।

ঘড়ীটি চালু করে দেখা গেল যে, আমার পরিকল্পনা মতে সকল কাজ চলছে। তবে কিছুটা সময়ের অগ্র-পশ্চাত হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্যাটা তত বেশী বড় নয়। আমার কাছে বড় একটি সমস্যা হল -প্রত্যেক পাঁচ মিনিটের প্রথমার্দ্ধে "ধীর" ও শেষার্ধে "দ্রুত" গতিতে ঘড়ীটি চলা। এ সমস্যাটি আমি সমাধান করতে পারছিলাম না।

অগ্রাহায়ণ - মাসের শেষার্ধে মিঃ জি, এন রায় দঃ লামচারি নিবাসী আঃ রহিম মৃধার বাড়ীতে আসলেন, আমি সেখানে তাঁকে আমার ঘড়ীটি দেখালাম। সময়ের হেরফের ও কিছু ত্রুটি থাকা সত্বেও তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং আমাকে পঁচিশ টাকা পুরুস্কার প্রদান করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৫

বরিশাল পাব্‌লিক লাইব্রেরীর শিক্ষা

(১৩৪৪)

বরিশালের পাব্‌লিক লাইব্রেরীর সহিত পরিচয় আমার শৈশব কাল হ'তে। তখন আমার বয়স দশ কি এগারো বছর। লেখতে ও পড়তে শিখিনি। অথচ ঐ লাইব্রেরীতে যেতাম প্রায়ই। বই-পুথি পড়রার জন্য নয়, তিমি মাছের হাড় দেখতে। শুনছিলাম যে, বিগত ১২৮৩ সালের বন্যার পানির সঙ্গে বঙ্গোপসাগর হতে একটি তিমি মাছ ভোলা মহকুমার দৌলত খাঁ থানার কোন এলাকায় প্রবেশ করছিল। সে বন্যায় ঐ অঞ্চলের মাঠ গুলোতে নাকি চৌদ্দ হাত পানি হয়েছিল। তথাচ ঐ পানিতেও সাঁতরিয়ে যেতে না পেরে মাছটি ওখানে মারা পড়ছিল। পরে ওটার হাড়-গোর গুলো বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে জন সাধারণের "দর্শনীয়" রূপে রাখা হয়েছে। তারই একটা অংশ রাখা হয়েছিল বরিশালে পাব্‌লিক লাইব্রেরীর বারান্দায়। শোনা যায় যে, আসল মাছটি লম্বায় ছিল প্রায় চল্লিশ হাত। হাড়-গোর দেখে ইহা "মিথ্যে" বলে মনে হয় না।

তখন হতে তিমি মাছের হাড় দেখবার কৌতূহল নিয়ে বহুদিন ওখানে গিয়েছি, হাড় দেখেছি, আর দেখেছি- বহু লোককে বই-পত্র পড়তে। শুনছিলাম যে, ওটা সরকারী গ্রন্থাগার। যে কোন লোক ওখানে বসে বই পত্র পড়তে পারে। আমি লাইব্রেরীর বারান্দায় গিয়েছি বহুদিন কিন্তু ভিতরে যাইনি একদিনও। কেননা অভাব ছিল - কিছুটা দরকারের ও কিছুটা সাহসের।

মনে পড়ে তখন ছিল ১৩৩৯ সাল। একদা পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে গেলাম। তিমি মাছের হাড় দেখবার জন্য নয়, বই পড়বার জন্য। স-সঙ্কোচে ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং টেবিলের ওপর পাঠকদের রেখে যাওয়া বই গুলো নেড়েচেড়ে দেখলাম ও কিছু কিছু পড়লাম। অজানা-অচেনা লোক বলে আমাকে কেহ কিছু বল্‌ল না দেখে সাহস পেলাম।

এর পরে বরিশালে গিয়ে সময় পেলে প্রায়ই আমি ওখানে যেতাম, বই পড়তাম; কিন্তু এতে তৃপ্তি হত না। কেননা স্বল্প সময়ে কোন বইয়ের অংশ বিশেষ পড়ে শান্তি পাওয়া যায় না। আবার গোটা বইয়ের ধারাবাহিক ভাবে পড়ে শেষ করতে হলে হয়ত কয়েক মাস কেটে যায়। হয়ত সে বইটা অন্য কোন পাঠক নিয়ে গেলে আর পড়াই হয় না। তবুও এভাবে পড়লাম কয়েক বছর।

"অন্য উদ্দেশ্যে বরিশাল গিয়ে সময় পেলে বই পড়া",- এ নিয়মটি পরিত্যাগ করে-"বই পড়ার উদ্দেশ্য বরিশাল যাওয়া"-আরম্ভ করলাম ১৩৪০ সাল থেকে। কিন্তু এতেও অশান্তি কমলো না কেননা- পাব্‌লিক লাইব্রেরীটি খোলা হয় বিকেল চারটায়। এতে সন্ধ্যা হবার পূর্বে (বারো মাসের গড়ে) বেলা থাকে মাত্র দুঘন্টা। পক্ষান্তরে - বরিশাল হতে লামচরি গ্রামের দূরত্ব প্রায় ছ-মাইল হেটে, আসতে সময়ও লাগে প্রায় দু ঘন্টা। কাজেই সন্ধ্যায় বাড়ীতে আসতে হলে বই পড়া যায় না, আর বই পড়তে হলে - যত ঘন্টা বই পড়া যায়, তত ঘন্টা রাত্রি হয় বাড়ীতে আসতে। তথাপি আমি বই পড়েছি – সন্ধ্যা ছটা, সাতটা, ও কোন দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত আটটা পর্যন্ত এবং বাড়ীতে এসেছি রাত আটটা, ন'টা বা কখনো দশটায়। এতে হাটার জন্য কষ্ট বা নিসঙ্গতার জন্য আমার ভয় হ'ত না। কষ্ট হত – শীত কালের রাতের শীতে, কালবৈশেখীর ঝড়ে এবং বর্ষা কালের বৃষ্টি ও জল-কাদায় চলতে। কেননা তখন লামচরি হতে বরিশাল যাতায়াতের জন্য কোন রকম রাস্তা ছিল না। সব রকম অসুবিধা সত্ত্বেও এভাবে পাবলিক লাইব্রেরীতে যাতায়াত করে বই পত্র পড়লাম প্রায় চার বছর। কিন্তু এভাবে বই পড়ায় শান্তির চেয়ে অশান্তিই ভোগ করতে হয় বেশী, লোকসানের তুলনায় লাভ হয় অল্প। কেননা এতে নিবিষ্ট মনে বই-পড়া হয় না। হয়ত অধ্যয়নের সুখ-স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙ্গে দেয় প্রত্যাবর্তনের বিভীষিকা মনোরাজ্যে এসে।

বহুদিন যাতায়াতের ফলে লাইব্রেরীয়ানের সাথে আমার কিছুটা পরিচয় হচ্ছিল। তাঁর কাছে জানতে পারলাম যে, কেহ লাইব্রেরীর "সদস্য" শ্রেণীভুক্ত হলে তিনি বই পত্র বাসায় নিয়ে পড়তে পারেন। আমি লাইব্রেরীর সদস্য হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি আমাকে বল্লেন যে, এখানে মিউনিসিপালিটির বাইরের কোন লোককে সদস্য করবার ও টাউনের বাইরে বই দেওয়ার নিয়ম নেই। টাউনে আমার কোন বন্ধু ব্যক্তি থাকলে, তাকে সদস্য করে, তার নামে বই নিয়ে আমি উহা বাড়ীতে এনে পড়তে পারি।

সে সময় বরিশাল শহরে আমার বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি কেউ ছিল না। তবে আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা আঃ রহিম মৃধার এক জন বন্ধু ছিলেন, চন্দ্রমানাই গ্রাম নিবাসী জনাব ওয়াজেদ আলী তালুকদার। বরিশালের চকের পোলের দক্ষিণ পাশে ফরিয়া পট্টির মোড়ে তখন তিনি টুপীর দোকান করতেন। একদিন আমি মৃধা সাহেব কে সাথে নিয়ে তালুকদার সাবের দোকানে গেলাম তাঁকে সুপারিশ করার জন্য এবং মৃধা সাহেব তাঁকে অনুরোধ করলেন - আমার পক্ষে পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য হয়ে আমার বই পড়ার সহায়তা করার জন্য। তিনি সম্মত হলেন।

একদা লাইব্রেরীতে গিয়ে সদস্য হবার আবেদন পত্রের ফরম এনে, তালুকদার সাহেবের নামে উহা লিখে তাঁর সই নিলাম এবং লাইব্রেরীর সেক্রেটারী সাহেবের অনুমোদন গ্রহণান্তে লাইব্রেরীয়ানের কাছে দাখিল করলাম। তৎসহ আরো দাখিল করলাম - ডিপোজিট হিসাবে ৩.০০ টাকা, ভর্তি ফি - ১.০০ টাকা ও মাসিক চাঁদা .৫০ পয়সা (৪.৫০)। রশিদ ও সনদ পেয়ে আমি পাবলিক লাইব্রেরীর (বেনামীতে) একজন সদস্য হলাম ১৩৪৪ সালের ১৯শে পৌষ তারিখে। এর ব্যবস্থাটা এরূপ হ'ল যে, তালুকদার সাহেব পাবলিক লাইব্রেরীর একজন সদস্য। আমি তাঁর দোকানের একজন কর্মচারী। তাই তাঁর পক্ষে আমি বই পত্র লেন-দেন করছি। লাইব্রেরী হতে এ দিন আমি গ্রহণ করলাম - "পৃথিবীর ইতিহাস" (৩য় খন্ড)। দুর্গাদাশ লাহিড়ী। পাঃ লাঃ নং- ত(৩,৩) (৪)।

---- সালে তালুকদার সাহেব তাঁর ব্যবসায় বন্ধ করে গ্রামের বাড়ীতে চলে যাওয়ায় লাইব্রেরী হতে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। অগত্যা আমাকে লাইব্রেরী হতে আমার ডিপোজিট (৩.০০) টাকা তুলে আনতে হয় এবং বাড়ীতে এনে বই পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

শুরু হ'তে সদস্য হবার আগে পর্যন্ত পাঃ লাঃ হতে কতখানা বই-পুথি পড়েছি, তার হিসাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখিনি। কিন্তু সদস্য হয়ে ------ এই --- বছরে --- চাঁদা দিয়ে পুস্তক পড়েছি ---- খানা। ইহা আমার আকাঙ্খার অর্ধেকেরও কম। আমি আশা করছিলাম যে, প্রতি সপ্তাহে একখানা করে বই পড়ব। তা হলে এ বছর বইয়ের সংখ্যা হ'ত --- খানা। কিন্তু কার্যতঃ হয়েছে --- - খানা। অর্থাৎ প্রতি .... দিনে একখানা করে বই লেনদেন হয়েছে। বই-পুথি আমার 'পড়বার" সময়ের অভাব হয় না। কেননা উহা আমার রাতের কাজ। সময়ের অভাব হয় "লেন-দেন" এর।

নিয়মিত কৃষিকাজ ছাড়া অতিরিক্ত আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাজ আমাকে এ সময় করতে হয়েছে। যথা - ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ সালিসী বোর্ড, পল্লী মঙ্গল সমিতি ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ দিনে ও রাতে যথারীতি সম্পন্ন করতে গিয়ে সময়ের ঘাটতিটা সমস্তই পড়েছে আমার অধ্যয়নের ভাগে। তাই আশানুরূপ বই পড়া হয় নাই।

লাইব্রেরীর সমস্ত বিভাগের বই আমি সমান হারে পড়িনি এবং কোন কোন বিভাগের বই আদৌ পড়িনি। আমি পড়েছি মাত্র - ধর্ম, ইতিহাস, ভ্রমণ, জীবনী, উপন্যাস, দর্শন ও বিজ্ঞান এবং কিছু মাসিক ও বার্ষিক পত্র-পত্রিকা। তবে সব চেয়ে বিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যাই বেশী।

AMARBOI.COM

সাইক্লোন
(১৩৪৮)

১০ই জ্যৈষ্ঠ। গরম তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে। আকাশ মেঘশূন্য ও কয়েকদিন যাবত বায়ু একদম নিরব। কয়েক জন কৃষি-মজুর নিয়ে মাঠে পাট নিড়াচ্ছিলাম। কিন্তু কাজ আগের তুলনায় অর্ধেকও হয়নি। সন্ধ্যার দশ মিনিট পূর্বেও বোধ হচ্ছিল যেন সূর্য হতে আগুন ঝরছে। ১১ই জ্যৈষ্ঠ। আকাশ আবছা মেঘে ঢাকা রইল, সমস্ত দিনে সূর্যের সাথে দেখা হল না, তবু মানুষ গরমে অতীষ্ট হয়ে উঠল, কেননা বাতাস স্তব্ধ। সরকারী পর্যায়ে আবহাওয়ার কোন পূর্বাভাস নেই, তবুও লোকে বলছে - "বন্যা হবে"।

১২ই জ্যৈষ্ঠ। সকাল হতে ঝাপসা মেঘে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হতে ও সামান্য পূবাল বাতাস বইতে লাগল। বিকেল হতে বৃষ্টিসহ বাতাসের বেগ বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং সন্ধ্যার পূর্বে সাইক্লোনের (বন্যার) পূর্ণ লক্ষণ দেখা দিল; রাত্র আটটা হতে শুরু হল পূরো মাত্রায় বন্যা। গাছ-পালা ভাংতে ও উপড়ে ফেলতে লাগল এবং ঘরদোর পড়তে লাগল। মানুষ ত্রাসে এঘরে ও ঘরে ছুটোছুটি করতে লাগল। আম, জাম, মাদারাদি সব গাছই কিছুনা কিছু ভাংল, অনেক গাছ উপরিয়ে পড়ল, বহু নারকেল-সুপারী গাছের হল মুন্ডুপাত এবং কলা গাছ হল একদম নিপাত। আমার বৈঠকখানা ঘরটা উড়িয়ে নিল রাত বারোটার মধ্যেই।

বন্যার বাতাস প্রথমতঃ- পূঃ দঃ হতে, পরে পূঃ-উঃ হতে, তৎপর উত্তর ঘুরিয়ে শেষ রাত্রে পশ্চিম হতে বইতে লাগল। এ সময় আমার বসত ঘরের পশ্চিম হতে একটা প্রকান্ড আমগাছ উপরিয়ে পড়ে পাকের ঘরখানা ভেঙ্গে দিল এবং বসত ঘরখানা চেপে ধরল। তাই বন্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাসে আর ঘরখানা নাড়তে পারল না। ফলে বন্যায় পড়া আমগাছটাই আমার বসত ঘরখানা রক্ষা করল। কিন্তু বেড়া-জানালাদি ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। বান-বৃষ্টির ঝাপটায় কাথা-বালিশ বা "বস্ত্র" বলতে কিছুই শুকনা থাকল না। ভিজে বস্ত্র গায়ে জড়িয়ে পরিজনসহ মরতে মরতে বেঁচে রইলাম। প্রতিবেশী ইয়াছিন আলী সিকদার নানাবিধ তত্ত্বমূলক আলাপ-আলোচনার জন্য প্রায়শঃ আসত আমার কাছে, এ দিনও সন্ধ্যায় আসছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বন্যা বৃদ্ধির ফলে আর ঘরে ফিরতে না পেরে আমাদের সাথে মরণ পথের যাত্রী হচ্ছিল সেও। ভোর রাত্রে বন্যা কমিয়ে সকাল বেশ প্রকৃতি শান্ত অবস্থা ধারণ করল। (১৩ই জ্যৈষ্ঠ)

বের হলাম গ্রামের অবস্থা দেখবার জন্য। ঘুরে দেখলাম- গ্রামের প্রায় চৌদ্দ আনা ঘরই পূরো বা আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে। গাছ-পালার ক্ষতির সংখ্যা নেই। প্রত্যেক গেরস্তের বাড়ীর উঠানে কাঁচা আম ও ডাব নারিকেলের স্তুপ, নারিকেল পড়েছে কাঁধি - সহ ছিড়ে। কোথায়ও মানুষ মরবার খবর পেলাম না, তবে গরুর খবর- পেলাম গোটা চারেক। কাক, শকুন, চিল ইত্যাদি - মৃত ও অর্ধমৃত দেখলাম অনেক। দুর্গত-পাখীদের মধ্যে ঘুঘুর সংখ্যাই বেশী। মাঠে-ফসল "নাই" বল্লেই চলে। সুখনা/জ্বালানী কাষ্ঠ কারো ঘরে নেই। পাকের অভাবে অনাহারে থাকতে হবে অনেককেই।

বেলা দশটায় বাড়ীতে এসে প্রথমত ঃ – ঘরের উপর ও পথে পড়ে থাকা গাছ-পালা কেটে সরাতে-লাগলাম। ৭-৮ দিন সময় লাগল বাড়ী-বাগান পরিষ্কার করতে। গাছ পালা ভাঙ্গার মধ্যে বড় রকমের একটা ক্ষতি হল আমার একটা 'ফজলি' আমের গাছ ভেঙ্গে; মূল্যের জন্য নয়, দুষ্প্রাপ্য বলে। গাছটিতে আম ফলত প্রচুর এবং প্রতিটি আমের ওজন হ'ত দেড় সেরের ওপর।

এ বন্যায় সমগ্র দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল সে ধারণা আমার নেই। তবে সরকারী নির্দেশ ক্রমে ইউনিয়ন বোর্ডের তরফ থেকে লামচরি মৌজার ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে কর্তৃপক্ষের নিকট আমি একটা রির্পোট প্রদান করছিলাম। কিন্তু তার ক্ষতির অঙ্কটা এখন ঠিক স্মরণ নেই। তবে আমার নিজের ক্ষতির একটা ফিরিস্তি আছে। তা এই

(১)	বৈঠক খানা ঘর	৫০০.০০
(২)	পাকের ঘর	১০০.০০
(৩)	বসত ঘর (আংশিক ক্ষতি)	১০০.০০
(৪)	গাছ পালা -ফল	২০০.০০
(৫)	ফসল	১০০০.০০
(৬)	বই-পুথি (৯৬৬ খানা)	৩০০০.০০
(৭)	জল-ঘড়ী (১টি)	১০০.০০
(৮)	ফটো এক খানা (মৃত মায়ের)	৫০.০০
	মোট	৫০৫০.০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বন্যায় কম-বেশী ক্ষতি এ অঞ্চলের সকলেরই হয়েছে, আমারও হয়েছে। তবে ওর অনেক ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু আমার (বই-পুথি [৯৬৬ খানা], জল-ঘড়ী, ফটো এক খানা [মৃত মায়ের]) তিনটা ক্ষতি অপূরণীয়। কেননা কায়িক শ্রম বা অর্থের বিনিময়ে উহা পূরণ করা সম্ভব নয়। যৌবনের যে উদ্দাম উৎসাহে পুস্তকাদি সংগ্রহ ও জলঘড়ী নির্মাণ করছিলাম, সে যৌবনও উৎসাহ আর ফিরে পাব না। কাজেই আমার কৃতকর্মেরও আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। অধিকন্তু বই-পুথি গুলোর মধ্যে এমন কতগুলো গ্রন্থ ছিল, যা এখন দুষ্প্রাপ্য। যেমন- সন্দ্বীপের ইতিহাস, শরলভুমি পরিমাণ, সহিদ নামা (পুথি) ইত্যাদি। বিশেষতঃ আমার সর্বস্বত্যাগ করেও পাব না মৃত মায়ের "ফটো" খানা।

বই-পত্র গুলো ছিল আমার অতিশয় প্রিয়, যাকে বলা যায় "প্রান-প্রিয়"। মাতৃ-তিরোধানে আমার রোদন আসে নি। কিন্তু বই গুলোর তিরোধানে আমি রোদনকে ফেরাতে পারিনি।

দুর্ভিক্ষ
(১৩৫০)

AMARBOI.COM

১৩৪৮ সালের মারাত্মক বন্যার ক্ষয়ক্ষতির জের চলছিল উনপঞ্চাশ সালে। সে বন্যায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল - আখ, পাট, তিল, আলু ইত্যাদি মাঠের যাবতীয় অর্থকরী ফসল। এতে কৃষক সমাজে দেখা দিয়েছিল দারুন অর্থ সঙ্কট এবং তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল - শিল্প, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এবং সরকারের রাজস্ব খাতেও। এর পর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত-উনপঞ্চাশ সালের প্রথমার্ধে শুরু হ'ল অতিবৃষ্টি ও অতিশয় জলস্ফিতী। ফলে ব্যাহত হ'ল আউশ ও আমন ধানের চাষ, নষ্ট হল আমন ধানের প্রায় পনর আনা ফসল। পক্ষান্তরে - এ বছরের কার্তিক হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত শেষার্ধে আদৌ বৃষ্টিপাত হ'ল না। ফলে রবি ফলন মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হ'ল। অধিকন্তু ১৩৫০ সালের আষাঢ় মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় আখ, পাট বিশেষতঃ আউশ ধানের চাষ করা সম্ভব হ'ল না। ফলে এদেশের মানুষের খাদ্য ও অর্থকষ্ট চরমে ঠেকল। আট চল্লিশ ও উনপঞ্চশের পুঞ্জীভূত অভাব পঞ্চাশে এসে রূপ নিল দুর্ভিক্ষের।

উনপঞ্চাশ সালে আমন ধান যা জন্মিল, তা কাটাই, মাড়াই ও ছাটাই করে পৌষ মাসেই চাল থাকল না অনেক কৃষকের ঘরেই। চিরাচরিত নিয়ম মাফিক ধান-চালের সর্বনিম্ন মূল্য থাকে পৌষ মাসে। কিন্তু এ বছর এ সময়টাতেই শুরু উহার মূল্য বৃদ্ধি হতে।

বিগত কয়েক বছর যাবত খাদ্য দ্রব্য গুলোর বিশেষতঃ চালের মূল্য ধীরে ধীরে বেড়েই চলছিল। ১৩১২ সালে চালের মূল্য ছিল প্রতি মন $২^{১}/_{২}$-$২^{৩}/_{৪}$ টাকা,

১৩৪৫ সালে ৩-$৩^{১}/_{৪}$

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩৪৭ সালে ৪,

১৩৪৮ সালে ৪$^{১}/_{২}$ – ৫ এবং

১৩৪৯ সালের পৌষ মাসেই মূল্য দাঁড়াল ৭-৮ টাকায়।

১৩৫০ সালের বৈশাখ মাসে চালের মন হ'ল ১৬ টাকা এবং আশ্বিণে উঠল ৬০ টাকায়।

আগের তুলনায় চালের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য ফসল ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য এবং শ্রমিকের মজুরী আদৌ বৃদ্ধি হল না, বরং কমে গেল। ফলে নিম্ন শ্রেণীর কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দিল অর্থ সঙ্কট, অধিকাংশেরই চাল কেনার ক্ষমতা থাকল না। আবার কেহ কেহ সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কোথায়ও চাল কিনতে না পেরে ট্যাকে টাকা নিয়ে অনাহারে রাতে শুয়ে থাকতে বাধ্য হ'ল। শুরু হল লোকের অল্পাহার, অর্ধাহার ও অনাহারের পালা। ভাতের অভাবে লোকে কাঁচা ফলমূল ও তরিতরকারী সিদ্ধ করে খেতে লাগল। যখন তাও জুঠল না, তখন - বুনো শাক-পাতা ও নানাবিধ অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে স্বাস্থ-নষ্ট হয়ে বিশেষতঃ পেটের পীড়ায় শত শত মানুষ মারা যেতে লাগল।

১৩৪৯ সালে আমার ভাগ্য-চক্রটি ঘুরছিল উল্টা পাকে। প্রতাপপুর মৌজার নূতন চরের হেলি, ধান ইত্যাদি গরু লায়ক জমি বাদে এ সময় আমার চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৪ কানি। এর মধ্যে প্রায় তিন কানি জমিই ছিল উচুঁ ভিটা। এতে কখনো আমন ধান জন্মিত না বা অতি অল্পই জন্মিত। এ বছর জলবৃদ্ধির দরুন আমার এক কানি নিচু জমির ফসল নষ্ট হলেও প্রায় তিন কানি উচুঁ জমিতে প্রচুর আমন ধান জন্মিল। এর পূর্বে আমার জমিতে কোন বছর ৫০-৬০ মণের অধিক আমন ধান জন্মিত না। কিন্তু এ বছর জন্মিল ১১০ মণ অর্থাৎ আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়া বিগত কয়েক বছর যাবত প্রতাপপুরের নূতন চর জমিতে আমার বোরো ধান জন্মিত বছরে ৩০-৪০ মণ করে। কিন্তু এ বছর জন্মিল ৬০ মণ।

আমার ক্ষেতের ধান-চাল সংবছর খেয়েদেয়ে এ যাবত উদ্বৃত্ত হত না কখনো। হয়ত কখনো কখনো দু এক মাসের খোরাকী চাল কিনতে হত। কিন্তু উনপঞ্চাশে আমার আমন ও বোরো ধানের ফলন অধিক হওয়ায় পঞ্চাশ সালে আমি চাল বিক্রি করলাম প্রায় এক হাজার টাকার মত।

১৩৫০ সালে কেন রূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগবশতঃ আমন ধানের চাষ ব্যাহতা হ'ল না। কিন্তু কৃষকদের আর্থিক অনটন ও স্বাস্থ্যগত কারণে ফসলের যথোপযুক্ত পরিচর্যা করা সম্ভব হ'ল না বলে ফসল অনেকটা কম হ'ল। তবুও হেমন্ত কাল হতে (নতুন চাল দেখা দিলে) দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ হাফ ছেড়ে বাঁচল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদিরের সান্নিধ্যে

(১৩৫৪)

১৩৫১ সালের কথা। চর বাড়ীয়া ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গাউয়াসার নিবাসী মৌঃ মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের প্রথমা কন্যা শিরীন বেগমের বিবাহ। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য এবং বন্ধু হিসাবে আমার নিমন্ত্রণ, মানী হিসাবেও। বহু লোকের সমাগম। কিন্তু অধিকাংশই আমার অপরিচিত। তথাপি একটি ছেলের চাল-চলন আমার দৃষ্টিকে আকর্ষন করছিল। পরিচয় নিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি সাপানিয়া নিবাসী মুন্সি হাতেম আলী কাজী সাহেবের জ্যেষ্ঠ ছেলে, নাম কাজী গোলাম কাদির।

মুন্সি সাহেব আমার পুরানো বন্ধু। ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণসালিশী বোর্ড, জুট কমিটি, ফুড কমিটি ইত্যাদি ইউনিয়নের বহু প্রতিষ্ঠানের সদস্য রূপে উভয়ে এক যোগে কাজ করেছি বহুদিন। মুন্সি সাহেব সময় সময় আমার কাছে বলতেন তার এই ছেলেটির লেখা-পড়ার একাগ্রতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্টের কথা। তাঁর এ ছেলেটি নাকি সল্প ভাষী, ভাবগম্ভীর ও নির্জন প্রিয়। ছেলেটি এ বছর বরিশালের বি,এম কলেজে দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।

বিবাহের চারদিন পূর্বেই আমি সে বাড়ীতে গিয়েছিলাম এবং দরজা বৈঠকখানা সাজাবার কাজে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। বিবাহের দিন বরযাত্রী আসবার ও তাদের খানাপিনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এদিক সেদিক তাকাবার আমার ফুরসুত ছিল না। আহারান্তে রাতে নিরিবিলি হলাম।

বিবাহ বাড়ীর দরজায় বিরাট সামিয়ানা টানানো হচ্ছিল এবং তার নিচে টেবিল-চেয়ার পাতা ছিল অনেক। আমি কাজী গোলাম কাদিরকে ডেকে এনে পূর্ব প্রান্তের এমন একটি টেবিল ঘিরে বসলাম, যেখানে কোন লোক সমাগম ছিল না। যদিও আমরা উভয়ে ওখানে ৪-৫ দিন যাবত অবস্থান করছিলাম, তথাপি কর্ম-ব্যস্ততার দরুন পরিচয় জ্ঞাপক ছিটে ফোটা আলাপ ছাড়া কোন বিশেষ আলোচনার সুযোগ পাই নাই। মনে পড়ে রাত দশটায় আমাদের আলোচনা শুরু হ'ল।

আমাদের আলোচনার বিষয় সমূহ কি ছিল, তা পরিষ্কার ভাবে স্মরণ না থাকলেও উহা যে বিবিধ তত্ত্ব মূলক ছিল, তা স্মরণ আছে। আলোচনা চলছিল প্রশ্নোত্তরে। কিন্তু উহা এতই গভীর ও ব্যাপক রূপে চলছিল যে, আলোচনা সমাপ্তির পূর্বেই মসজিদে ফজরের আজান পড়ল। আমাদের রাতভর আলোচনা সমুহ দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি হলেন মৌঃ মোহাম্মদ আলী খাঁ। ভোরে রসিকতা করে তিনি আমাকে বল্লেন - "মাতব্বর সাব! কাদেরের সঙ্গে বাজে কথায় রাতটা না কাটায়ে বরং তাস খেলে কাটালে লাভ হ'ত বেশী।

দুজন অপরিচিত ব্যক্তির প্রাথমিক পরিচয়ে আলোচনা যে এতাধিক ব্যাপক হতে পারল, তার কারণ বোধ হয় এই যে, জগত ও জীবন সর্ম্পকে আমি যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম, তার যথাযথ সমাধান করা অনেক প্রধান শিক্ষাবিদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। অথচ শিক্ষোন্মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন তরুনের মুখে ওসবের বিজ্ঞান ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাধান পেয়ে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম, যার ফলে আলোচনা বাড়ছিল। পক্ষান্তরে- এক জন অশিক্ষিত কৃষকের মুখে এ ধরনের আলোচনা শুনে বোধ হয় যে তিনিও আমার মনো রাজ্যের অলিগলি পর্যবেক্ষনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আলোচনা বাড়াচ্ছিলেন। ফলতঃ এ দিনের আলোচনার মাধ্যমেই আমাদের উভয়ের মানসিক পরিচয় হয়ে গেল। জানতে পেলাম যে, এ বছর বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে কাজী সাহেব এম,এ ডিগ্রী লাভের জন্য কলকাতায় যাবেন।

কাজী সাহেবের সাথে আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাত ঘটে ১৩৫৪ সালে, তিনি এম, এ ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফেরার পর। চর বাড়ীয়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মোঃ মোহম্মদ আলী খাঁন ছিলেন একজন গুণী ব্যক্তি। তাই তিনি গুণীদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদান করতে জানতেন। কাজী গোলাম কাদির সাহেব চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের সর্ব প্রথম এম, এ ডিগ্রী প্রাপ্ত যুবক। তাই তার যথোপযুক্ত সম্মান ও ইউনিয়নবাসী অন্যান্য যুবক (ছাত্র)দের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি এক মহতী সভার আয়োজন করলেন কাগাগুরা হাই স্কুল প্রাঙ্গনে। এই সভায় বহু উচ্চ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্বেও তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে আমাকে দান করা হয় সভাপতির আসন ও মর্যাদা এবং কাজী গোলাম কাদিরকে দান করা হয় পূষ্পমাল্য ও অভিনন্দন পত্র।

সামান্য বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করাটা আমার একটা স্বভাব। হয়ত কখনো চিন্তাসাগরে ভেসে যেতাম বহুদূরে। কিন্তু কুল পেতাম না, শুধু হাবুডুবু খেতাম আর ভোগ করতাম নৈরাশ্যের মানসিক যাতনা। আমার তাত্বিক চিন্তা জগতের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত "আমি"। "আমি" হতেই আমার প্রাথমিক ভাবনার শুরু। যেমন - "আমি" কে? "আমি" পূর্বে কোথায় ছিলাম? "আমি" পরে কোথায় যাব? "আমি" আছি কেন? "আমি" থাকবো না কেন? আমার কেহ সৃষ্টিকর্তা আছেন কি-না? থাকিলে সে কোথায় এবং কি রূপ? ইত্যাদি। এ ভাবনাটা শুধু "আমি" তে সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত মানুষ, জীব ও বিশ্বের প্রতি আরোপ করা হলে, দেখা যায় যে, আমার ভাবনার মৌলিক বিষয় থাকে তিনটি। যথা - জীব, জগত ও ঈশ্বর।

১৩৫৪ সালে কাজী গোলাম কাদির সাহেব বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে (দর্শন বিভাগে) অধ্যাপক পদে নিয়োজিত হলেন এবং আমি এই সময় হতে তাঁর কাছে যাতায়াত করে উপরোক্তরূপ বহুবিধ তত্বমূলক সমস্যার সমাধান কল্পে আলাপ আলোচনা করতে লাগলাম।

আমার বহু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বা দার্শনিক সমাধান আমি কাজী সাহেবের কাছে পেয়েছি। আর আশ্বাস পেয়েছি যে, দর্শনের পথ ধরে এগুতে থাকলে ভাবিষ্যতে আরো বহু সমস্যার সমাধান পেতে থাকব। বাংলা ভাষায় দর্শনের পুস্তকাদি বেশী পাওয়া যায় না। তথাপি কাজী সাহেব আমাকে কয়েক খানা পুস্তক সংগ্রহ করে দিলেন। যথা-ন্যায় দর্শন, গ্রীক দর্শন, দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি, মায়াবাদ ইত্যাদি। আমি কাজী গোলাম কাদির সাহেবের নিকট দর্শনে দীক্ষা নিলাম (১০/৮/৫৪ বাং)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু পুত্র ও বয়ঃকনিষ্ঠ বলে কাজী গোলাম কাদির আমার পুত্রতুল্য। কিন্তু জ্ঞানের মাপকাঠিতে তিনি বৃদ্ধ পিতৃতুল্য এবং শিক্ষক হিসাবে তিনি আমার গুরুস্থানীয়। সুতরাং তিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আমার জীবনের মানোন্নয়নের একটি প্রধান অবলম্বন তিনি। তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা না পেলে হয়ত আমার জীবন প্রবাহের গতি অন্য দিকে চলে যেত। বিশেষতঃ আমার কলমের চরিত্র সংশোধন করেছেন তিনি.....আমার বাড়ী হতে সাপানিয়া কাজী বাড়ীর দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। বরিশালে বাড়ী কেনার পূর্বে কাজী সাহেব বাড়ী হতেই কলেজে যাতায়াত করতেন তাই কোন ছুটি ছাটা বা সাপ্তাহিক বন্ধে- কোন রূপ জিজ্ঞাসা বা টুকিটাকি লেখা নিয়ে আমি বহুদিন কাজী সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছি এবং যতবারই গিয়েছি, ততবারই তাঁর সাদর সম্ভাষন ও আলোচনার আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হইয়েছি। বিশেষতঃ সকল রকম জিজ্ঞাসার আশানুরূপ ফল লাভ করেছি। কোন কোন সময় আমাদের আলোচনা একটানা দু-তিন ঘন্টা ধরে চলত। ইহা দেখে শুনে তাঁর আব্বা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করতেন- "মাতব্বর সাহেব! কাদের পড়ার করো সাথে কোন রূপ আলাপ আলোচনা করে না সব সময় লোকের সমাগম বা সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে চায়। এমন কি কলেজ হতে বাড়ীতে এসে সামনের বারান্দায় কোন লোক জন থাকলে সে পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে, দেখা পেলে লোকেরা তার সাথে আলাপ করবে সেই ভয়ে। আর আপনার সাথে আলোচনায় ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করে কেন? আমি তাঁকে বলতাম যে, ওটা তাঁর অহঙ্কার-নয়, বাজে কথায় সময়ের অযথা অপচয় না করার প্রচেষ্টা মাত্র। আপনার ছেলেটি তার রুচি সম্মত আলোচনায় সর্বদাই উৎসাহী।

AMARBOI.COM

লাল গোলা যাতায়াত

৩/১০/৫৪- ১৩/১০/৫৪

উত্তরোত্তর কর্ষনযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও কিছুটা উন্নত ধরনের কৃষি কাজের প্রচেষ্টার দরুন এখন আর আমার এক জোড়া বলদের দ্বারা কৃষি কাজ চলে না। অনেক দিন হতে ভাবতে ছিলাম যে, হয়ত দুজোড়া বলদ অথবা এক জোড়া ভাল মোষ কেনা দরকার। ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম যে, মোষই কেনব। মোষ কেনার জন্য – সালুকা, বদিউল্লা, পাতার হাট ইত্যাদি অনেক স্থানে খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথায়ও পছন্দ মত মোষ পেলাম না। শোনতে পেলাম যে, যশোরের একটি হাটে (হাটটির নাম এখন স্মরণ নাই) ভাল মোষ পাওয়া যায় স্থির করলাম মোষ কেনার জন্যে যশোরে যাব। আমার সাথে যাবে স্থানীয় আদম আলী গোলদার ও আঃ মজিদ মাতব্বর গরু কেনার জন্যে এবং আমার রাখাল রূপে নাজেম আলী খান।

১৩৫৪ সালের ৩রা মাঘ আমরা যাত্রা করলাম যশোরে। আমি সঙ্গে নিলাম-নগদ ছ-শ টাকা, পাঁচ সের চিড়া, একখানা কাথা, একটি কম্বল, একটি গরম কোট, দু গোছা রশি এবং ঘটি-বাটি-থালা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র। আর নিলাম- " আশি দিনে ভূপ্রদক্ষিণ" ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রবিণসন ক্রুশো" নামক দুখানা বই রেল ও স্টিমারে বসে পড়বর জন্য। বেলা দুটোয় বাড়ী থেকে যাত্রা করে চারটায় বরিশাল গিয়ে খুলনাগামী জাহাজে চড়ে বসলাম।

জাহাজে বসে আলাপ হ'ল ভোলা নিবাসী কফিলদ্দি বেপারীর সাথে। তাঁরা একদলে লোক আট জন। তাঁরাও চলছে যশোরে মোষ কেনার জন্যে। একই জিলার অধিবাসী ও একই উদ্দেশে যাচ্ছি বলে আমাদের উভয় দলের লোকদের মধ্যে একটা মৈত্রীভাব এসে গেল; দুদলে প্রায় একদল হয়ে গেলাম। বেশ আরামেই সময় কাটতে লাগল জাহাজে।

৪ঠা মাঘ। ভোরে আমরা খুলনা পৌছলাম এবং ট্রেন যোগে যশোরে গিয়ে একটি হোটেলে খেয়ে নিলাম। কিন্তু সেখানে জানতে পেলাম যে, আমরা যে হাটটিতে মোষ-গরু কেনার উদ্দেশ্যে গিয়েছি, বর্তমানে সে হাটটি মেলে না। শুনে আমরা একটা মস্ত সমস্যায় পড়ে গেলাম।

কফিলদ্দি বেপারী বহু বছর যাবত উত্তরাঞ্চল হতে গরু-মোষ কিনে এনে নিজাঞ্চলে বিক্রি করেন এবং তাঁরা উত্তর অঞ্চলে যাতায়াত করেন বছরে সাত-আট বার। ব্যবসায়ের ক্ষেত্র তাঁদের -যশোর, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, দারভাঙ্গা, মুজাফফার পুর, কটিহার, হরিহর ছত্র ইত্যাদি স্থান সমূহ। তাঁরা স্থির করলেন- লাল গোলা যাবেন। "লাল গোলা" স্থানটি মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত- নবাব সিরাজদ্দৌলার নিধন ক্ষেত্র কুখ্যাত ভগবান গোলার ১৩-১৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এস্থানটা যদিও ঐ ভারত রাষ্ট্রের- অন্তর্ভুক্ত তবুও যাতায়াতে এখনো পাসপোর্ট-ভিসা লাগে না।

মোষ-গরু কেনার অত দূরাঞ্চলে যাবার ইচ্ছা আমাদের কারো ছিল না। তবুও "ইচ্ছা" ও "অনিচ্ছা" এ দুলিতে দুলিতে ওদের সাথে ট্রেনে ওঠলাম। যশোর হতে রানাঘাট গিয়ে ট্রেন বদল করতে হ'ল এবং ট্রেনে বসে বসেই রাত কাটালাম।

৫ই মাঘ ভোরে আমরা লালগোলা পৌঁছলাম গরু, ঘোড়া, মোষ ইত্যাদি পশু বিক্রয়ের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র লালগোলা হাট। হাটের আসে পাশে বহু দালালের বাড়ী। দালালেরা অনেকেই ওখানের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি আগন্তক বেপারীরা ওদের কোন না কোনও দালালের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। তারা বেপারীদের কেনা-বেচায় সহযোগিতা, পানাহার ও থাকার ব্যবস্থা এবং বিপদে-আপদে সাহায্য করে। অবশ্য এ জন্য তারা ব্যাপারীদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে একটা ভাতা আদায় করে। ওখানের বিশিষ্ট দালাল আলহাজ্ব কলিমুদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। পরের দিন হাট বসবে।

আহার ও বিশ্রামান্তে বিকালে আমরা কিছু সময় লালগোলা বন্দরটি ঘোরাফেরা করলাম। দেখার মত বস্তু বিশেষ কিছু ওখানে নাই। ওখানের স্মৃতি চিহ্ন সরূপ আমি একটি এনামেলের কেতলি কিনলাম, দাম দশ আনা। ওটি আমার ঘরে আজো আছে (১৩৮২)।

লালগোলার যে সব ছবি আমার স্মৃতি পটে আজো অম্লান আছে, তার মধ্যে প্রধান হ'ল- দালাল বাড়ীর ভাত-ডাল ও কাথা-বালিশ। ভাত পাক করা হয় মাড় সহ এবং চাল ফুটানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় বেশী। ফলে "ভাত", এই নামটি ঠিক থাকলেও উহা আসলে হয় আটা বা কাই। তবে একটা সুবিধা ছিল এই যে, উহা দাঁতে চিবুতে হয় না, হাতে ধরে মুখে দিলে স্বেচ্ছায় পেটের মধ্যে চলে যায়।

দালাল বাড়ী সব শুদ্ধ পাঁচ বেলা আহার করছিলাম। সব বেলাতেই পাক করা হ'ল কাঁচা মাসকলাই (ডাইল) উপকরণ- জল, লবণ ও কাঁচা মরিচ; উহা বাটা নয়, কাটা। স্বাদে-গন্ধে উহা "খাদ্য" বলে মনে হত না। তবু নিরোপায় হয়ে সবাই উহাই খেত। কিন্তু আমি উহা খেতে পারতাম না, খেতাম চিড়া। তবে ওয়াক্ত (মিল) হিসাবে খাবারের পুরো দামটাই দালালকে দিতে হচ্ছে।

বেপারীদের থাকার ঘরখানা বেশ বড়, ২৫-৩০ জন লোক শুতে-বসতে পারে। তবে খাট্ নাই এক খানাও, মেঝেই বিছানা পেতে শুতে হয়। কাথা-বালিশের চেহারা অত্যাধিক মলীন, কয়েক বছরের অসিদ্ধ। সাধারণতঃ- মোষ-গরুর বেপারীরা কেহই জুতা নিয়ে চলে না। কেননা ওসব পশু সাথে নিয়ে চলতে হ'লে ওদের পথে ওদের মতই চলতে হয়, ডাঙ্গা-ডোবা ও জল-কাদার বিচার করা চলে না। পক্ষান্তরে- সমস্ত বেপারীদের খরচ জোগানোও দালালদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে দালাল বাড়ীর বিছানায়ে অধিকাংশ বেপারীই অধৌত পদে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। কাজেই কাথা ও মাটি হয় একাকার।

বালিশের অবস্থা আরো শোচনীয়। দালাল বাড়ীর ডাল-সালুনে তেল পড়ে না। তাই দালালকে জব্দ করার মানসিকতা নিয়েই বেপারীরা গায়-মাথায়ে তেল মাখায় বেশী। কিন্তু উহার অধিকাংশ তেলই পর্যবসিত হয় কাথায়ে বিশেষভাবে বালিশে। তদুপরি- বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগাং, ইত্যাদি জিলাবাসী মানুসের গায়ের পাঁচ মিশালী গন্ধে কাথা-বালিশ সিক্ত। কোন কোন বেপারী উহা ব্যবহার করতে পারে না, তাদের থাকতে হয়- মাঘ মাসের শীতেও নিজস্ব সামান্য কাথা-কম্বল গায় জড়ায়ে, আমাকেও থাকতে হ'ল তাই।

৬ই মাঘ। আমাদের দালাল বাড়ীর নিকটেই লালগোলা হাট। আমরা কিছু খেয়ে দেয়ে হাটে গেলাম। শত শত গরু, ঘোড়া, ছাগ ইত্যাদি আমদানী হ'ল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ মোষ আমদানী বেশী হ'ল না। যে কটি আমদানী হ'ল- কয়েক জন বেপারী- তা বাতান (পাল) সহ কিনে ফেললো। মোষ কিনতে না পেরে আমাদের ভোলাবাসী সঙ্গিরা স্থির করলেন যে, মোষ কেনার জন্য তারা বিহারের শোনপুর যাবেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হচ্ছিল যে, মোষ-গরু কিনে আমরা উভয় দলে একখানা নৌকো ভাড়া করে একত্রে দেশে ফিরব এবং উহারা আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়ে যাবার পথে নদীর দক্ষিণ তীরে আমাদেরকে শায়েস্তাবাদ নামিয়ে দিয়ে পাতার হাট হয়ে ভোলা যাবেন। কিন্তু সে চুক্তি নষ্ট হওয়ায় আমরা সমূহ বিপদে পড়লাম। আমার সঙ্গিরা বলতে লাগলেন যে, তারা শোনপুর যাবেন না। হয়ত গরু কিনে, নয়ত খালি মানুষই ওখান থেকে দেশে ফেরবেন। এখন আমার সমস্যা হ'ল দুটি। হয়ত মোষ কেনার জন্য সঙ্গিদের ছেড়ে ভোলাবাসীদের সাথে শোনপুর যেতে হবে নচেৎ মোষ কেনা ছেড়ে ওখানে সঙ্গীদের সাথে দেশে আসতে হবে। ভাবনা-চিন্তা ও আলোচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ইত্যাবসরে- রবিশালের কালাইয়া নিবাসী এক জন বেপারীর নৌকোর দেশে আসবার আশ্বাস পেয়ে আমার সঙ্গিদ্বয় গরু কিনে ফেলেছেন। অগত্যা আমিও মোষ কেনার নেশা ভেঙ্গে সন্ধ্যার পরে চারশ টাকা মূল্যে দুটো গরু কেনলাম এবং দালাল বাড়ী এসে গরু পাহারা দিয়ে রাত কাটালাম।

৭ই মাঘ, ভোর হতে সানন্দে বাড়ীতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু সে আনন্দ বেশী সময় থাকল না। শোনলাম যে, কালাইয়া বাসী বেপারীদের নৌকোয় আমাদের স্থান হবে না। কেননা তাদের নৌকো পুরো বোঝাই হয়ে গেছে। লালগোলা থেকে পায়ে হেটে বরিশালে আসবার সাধ্য নাই, রেল-স্টিমারের সুব্যবস্থা নাই; উপায় এক মাত্র নৌকো। তাও আবার ৩০টি গরু-মোষ না হলে কোন নৌকো পাওয়া যায় না। আমাদের গরু সবে মাত্র ৬টি। কাজেই আমাদের পক্ষে স্বতন্ত্র নৌকো ভাড়া করা সম্ভব নয়। পার্শ্ববতি বহু দালাল বাড়ী খোঁজ করে কোথায়ও বরিশালগামী কোন নৌকো পাওয়া গেল না। তবে অপেক্ষাকৃত নিকটের এক খানা নৌকো পাওয়া গেল, নামতে হবে ফরিদপুরের হাজীগঞ্জে। উপায়ান্তর না দেখে স্থির করলাম- উপোসের চেয়ে চিড়া ভাল।

হাজীগঞ্জের বেপারীদের প্রধান হলেন এন্তাজ আলী খাঁ এবং তার সহগামী হচ্ছেন- আপছারদ্দিন বেপারী প্রমুখ আরো এগারো জন। গরুর সংখ্যা- ওঁদের ৭২ এবং আমাদের ৬টি সহ মোট ৭৮টি। ..(অস্পষ্ট)... দিতে হবে ৮০ গরুর সং চারশ টাকা। কেননা...(অস্পষ্ট)... মালবহন ক্ষমতা ও ভাড়া নির্ধারিত হয় ..(অস্পষ্ট)... দ্বারা। যেমন- ৫০ গরুর নৌকো, ৬০, ৭০ বা ৮০ গরুর নৌকো ..(অস্পষ্ট)...এবং ভাড়াও নিরুপিত হয় ঐ অনুপাতে। ৬টি গরু বোঝাই করে আমরা এক খানা (সবচেয়ে ছোট) ৩০ গরুর নৌকো ভাড়া করে আনতে পারতাম। কিন্তু তার ভাড়া দিতে হ'ত ৩০ গরুর।

লালগোলা হতে হাজীগঞ্জ পৌঁছতে সময় লাগবার কথা ৪ দিন। নির্ধারিত ভাড়ার টাকার মধ্যে থাকবে- গন্তব্য স্থানে না পৌঁছান পর্যন্ত মাঝিদের নিজ ব্যয়ে বেপারীদের পাক করে খাওয়ানো, গরুর খোরাকী জোগানো, প্রত্যহ সন্ধ্যায় নৌকো যেখানেই রাখা হোক না কেন, সেখানে গরু নামানো ও নাড়া-কুটা খাওয়ানো এবং তার পরের দিন ভোরে নৌকোয় উঠানো ইত্যাদি। বেপারীরা শুধু নৌকোয় উঠে বসবে ও গন্তব্য স্থানে নেমে যাবে। আর এর মধ্যেকার সময়ে তারা- গান, গল্প, তাস খেলা ও নিদ্রা, এসব কাজের যার যেটা ইচ্ছা, সে তা করবে।

৭৮টি গরু ও তার চার দিনের খাবার বিচালী, মাঝি-মাল্লাও বেপারীদের সহ একুশ জন মানুষের খাবার মালামাল ও কাঠ-কুটা ইত্যাদি নৌকোয় বোঝাই করতে বেলা ১০টা বেজে গেল। অনুকুল বাতাসে মাঝিরা নৌকোয় পাল তুলে দিল। বোধ হয়- জীবনের শেষ দেখা দেখে আমরা লালগোলা ত্যাগ করলাম এবং সানন্দে পদ্মা নদীর ও তার উভয় তীরের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

আমাদের নৌকো খানা রাজশাহী শহরের পাশ দিয়ে চলছিল। মাঝিরা আস্তে আস্তে পাল নামিয়ে দিল এবং সাহেদ আলী নামক একজন মাল্লা শহরে উঠল বাজার করার জন্যে। শহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখবার লোভ সামলাতে না পেরে আমরাও কয়েক জন ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)... পূব দিকে নৌকো রাখবার জন্যে একটা ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)... পাল তুলে দিল। আমি সাহেদকে অনুসরণ ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)...কিন্তু সে এতই দ্রুত গতিতে চলতে লাগল যে, গাড়ীর ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)... লোকের ভীড় ঠেলে ওর প্রতি দৃষ্টি রেখে এদিক ওদিক তাকানো ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)...না মোটেই। শহর দেখার চেয়ে সাহেদকে দেখাই হল আমাদের ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)... কেননা সাহেদকে হারালে- নৌকো হারাবো, সঙ্গিদের, হারাবো মালামাল এবং গরু গুলোও। তার পর কি হবে? অত ভাববার সময় পেলাম না, ত্রস্তপদে চললাম।

শহর দেখবার একটু ফুরসুত পেলাম- সাহেদ যখন বাজারে গিয়ে দাড়িয়ে দাড়িয়ে পেইজ-রোশন ও তেল-লবণ কিনল তখন। কিন্তু দেখতে পেলাম শুধু আশে-পাশের বাকালী ও মুদী দোকানগুলো সে দৃশ্যটা আজো আমার মনে পড়ে এবং অন্ধের হাতী দেখার মত আমারও মনে হয়- রাজশাহী শহরটা বুঝি একটা বাজার মাত্র।

মাঝিরা পূর্বনির্ধারিত স্থানে নৌকো থামিয়ে রেখেছিল। আমরা নৌকোয় আসলে ওরা পূনঃ পাল তুলে দিল। সন্ধ্যা হলে পদ্মা গাঙ্গের দক্ষিণ তীরে একটা চরে নৌকো বেঁধে- মাঝিরা গরু গুলো চরে উঠিয়ে সারি করে বাঁধল, বিচালী খেতে দিল এবং পালাক্রমে সমস্ত রাত পাহারা দিল।

৮ই মাঘ। খুব ভোরে মাঝিরা গরু গুলো নৌকোয় তুলে পাল টানিয়ে দিল। মাঝিরা আমাদের বললো- "আজ আপনারা দেখতে পাবেন সারার পোল", সানন্দে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

চলছি আমরা পদ্মা নদীর বুকের উপর দিয়ে। এ নদীটি বিহার প্রদেশ হয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে এবং বাংলাদেশকে করেছে দুভাগে বিভক্ত। এর উত্তর তীরে রয়েছে ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)...ঢাকা ও কুমিল্লা জিলা এবং দক্ষিণ ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)... কুষ্টিয়া ফরিদপুর ও বরিশাল জিলা। ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)...উভয় বাংলার স্থল পথের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম সারার পোল বা হার্ডিঞ্জ ব্রীজ।

অনেক দূর হতে পোলটি দেখা যাচ্ছিল। আমাদের নৌকো পোলটি অতিক্রম করল বেলা ৩টায়। এক সারি স্তম্ভের উপর পোলটি নির্মিত। স্তম্ভগুলো গুনছিলাম, কিন্তু সে সংখ্যাটি এখন স্মরণ নাই স্থাপত্য বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের একটি নিদর্শন এ পোলটি। এর নির্মাণ কৌশল ও বিপুলতা দেখে তাক লেগে যায়। ইচ্ছা হ'ল যে, উপরে উঠে পোলটির- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা মেপে ও নির্মাণ কৌশল পর্যবেক্ষণ করে দেখি। কিন্তু মাঝিরা তাদের সময় নষ্ট করতে রাজী হ'ল না। যতক্ষণ দেখা গেল, পোলটি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। রাত ৯টায় একটা চরে মাঝিরা নৌকো বাঁধল।

প্রত্যহ ভোরে যাত্রা ও রাতে বিশ্রাম। বেশ আরামেই সময় কাটছিল। কোনরূপ বিপদের সম্মুখিন হতে হ'ল না। বেপারীরা সময় কাটাতে লাগলেন- নানারূপ গান-গল্প, তাস খেলা ও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিদ্রায়। আমি বাড়ী হতে আশা অবধি মাত্র এ কয়টা দিনই বই পড়তে সুযোগ পেলাম।

১০ই মাঘ। বেলা ৪টায় আমাদের গন্তব্য-স্থানে নৌকো পৌছল- ফরিদপুর জিলার উত্তর সীমান্ত হাজীগঞ্জে। সবাই মিলে নৌকো ভাড়ার টাকা চুকিয়ে দিয়ে তটে উঠে গরু নিয়ে যার যে দিকে বাড়ী, সে দিকে সে যেতে লাগলেন। কিন্তু আমরা যাব কোন্ দিকে, তা আদৌ জানি না। তবে এই মাত্র জানি যে, মাদারীপুর হয়ে আমাদের দেশে আসতে হবে। ওখান হতে মাদারীপুরের দিকে আসবার যাত্রী মাত্র এক জন, আমরা তাঁর অনুগামী হলাম। রাত...(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)...শৌলডুবী গ্রামে আপছারদ্দিন বেপারীর বাড়ী ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)...মনে হল যে, তিনি নেহায়ত গরীব মানুষ। তার ঘাড়ে পড়া মেহমান আমরা। তা-ও আবার সংখ্যা ...(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)... টের পেলাম যে, তাঁর গৃহিনী চটে আগুন হয়েছে। আমাদের দুরবস্থা ও গৃহিনীর অবস্থা, দুদিক সামলাতে বেপারী বিব্রত। তিনি কখন বাড়ীতে আসবেন, তার নিশ্চয়তা না থাকায় তাঁর জন্যে ভাতের জোগান ছিল না। তবে ছেলে-পুলের জন্যে কিছু ভাত ছিল। বোধ হয় যে, তাতে বেপারী সাবের একার চল্‌ত। তিনি উহাই আমাদেরকে এনে দিলেন এবং কিছু মানী তরকারী। আমাদের শিকি পেটা হলেও কতকটা শান্তি পেলাম। কিন্তু শোবার জায়গা নেই। কম্বল মুড়ি দিয়ে গরুর রশি ধরে শুয়ে থাকলাম একটা নাড়ার কুড়ের কাছে।

১১ই মাঘ। রাত শেষ না হতেই বেপারী সাব জেগে আমাদের ডাকিয়ে তোলেন এবং পথ দেখিয়ে ও কিছুদূর এগিয়ে দিলেন এবং পথের দিনের পথের ইঙ্গিত দিয়ে বিদায় হলেন। আমরা পথ চলতে লাগলাম।

সমস্ত দিন অবিশ্রাম চললাম আর হাটতে হাটতে খেলাম শুকনো চিড়া ও ডোবার জল। সন্ধ্যা হল, কিন্তু রাত কাটাবার মত জায়গা পেলাম না। লোকে বলল- কালীর বাজার ভিন্ন নিরাপদ জায়গা নাই। তা এখনো প্রায় চার মাইল দূরে। সে দিন ছিল কালীর বাজারের হাটবার। সন্ধ্যার অনেক পরেও পথে লোকের যাতায়াত ছিল যথেষ্ট। কালীর বাজার পর্যন্ত যেতে বিশেষ কোন অসুবিধা হল না। ...(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)... লোক গুলো নেহায়ত সৎ। আমরা সেখানে ..(পাঠোদ্ধার করা যায় নাই)..."ইউনিয়ন বোর্ডের একটা খালি ঘর। প্রেসিডেন্ট অনুমতি দিলে আপনারা ওখানে থাকতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ী বাজারের নিকটেই। ছোকরাটি আমাকে নিয়ে সে বাড়ীতে গেল এবং সাহেবকে আমাদের আগমন-কাহিনী জানাল। শুনে সাহেব আমাদের সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন এবং ছেলেটিকে আরো বলে দিলেন যে, বাজারের সবাই যেন আমাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখে এবং যত্ন নেয়, যাতে আমাদের কোন রূপ অসুবিধা না হয়। সাহেবের অমায়িক ব্যবহার ও সাদর সম্ভাষণে প্রীত হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাইয়ে বাজারে এলাম।

আমাদের থাকার চিন্তা দূর হল, এখন খাবার। সারাদিন শুকনো চিড়া চিবিয়ে চিবিয়ে মুখটা থেতো হয়ে গেছে। পাক-পাত্র আমাদের সাথে কিছুই নাই। তাই ভেবেছিলাম যে, যদি কিছু গুড় ও দু-একটি মেটে বাসুন পাই, তা হলে ভিজিয়ে চিড়া খাব। আমাদের অভিপ্রায় শুনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজারের বাসিন্দারা এক বাক্যে সবাই বললেন তা হবে না। এখানে বসে আপনাদের চিড়া খেতে দেব না। পাক করতে হবে। "আমাদের কিছুই নাই পাক করার উপকরন"। সবাই বললেন- "আপনাদের না থাকুক, আমাদের ত আছে।"

সে সময়টাতে বাংলাদেশে কেরোসিন তেলের একান্ত অভাব। প্রথমেই তাঁরা কেরোসিন ভরে একটা বাতি এনে দিলেন। তার পর কেহ চাল, কেহ ডাল, কেহ লবণ এবং হলদি-মরিচ, পেঁইজ-রোসনাদি পাকের দ্রব্য সবই এনে দিলেন। হাটের কাছেই কুমার বাড়ী ছিল। সেখান হতে পাতিল এনে দিলেন এবং কেহ নিজ বাড়ী হতে এনে দিলেন কাষ্ঠ। আমরা পাক করার কাজ শুরু করলাম। কিন্তু পারলাম না, পাক করলেন প্রায় তাঁরাই। ভোজনান্তে গরুর রশি কোমরে বেঁধে শুয়ে থাকলাম বোর্ড ঘরে।

১২ই মাঘ। সকালে স্থানীয় লোকদের ডেকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। উহাঁরা আমাদের মাদারীপুরের যাবার পথের একটা পরিচয় দিয়ে দিলেন। আমি উহা অনুসরন করে যাত্রা করলাম। বেলা ১০টায় মাদারীপুর এসে কিছুটা বিশ্রাম করে পূনঃ চলতে লাগলাম। সমস্ত দিন হেটে ২টায় এসে পৌঁছলাম শীকারপুর।

রাত ছিল জ্যোৎস্না। তাই পথ চলতে রাতেও কোন অসুবিধা হচ্ছিল না, কষ্ট হচ্ছিল শুধু ভাতে ও শীতে। তবুও ইচ্ছা ছিল যে, একটানা হেটে আসব বাড়ী পর্যন্ত, আর কোথায়ও বিশ্রাম নেব না। কিন্তু খেওয়া বন্ধ বলে শীকারপুরেই বিশ্রাম নিতে হল। নদের ধারে একটা গাছের তলায় আমরা আস্তানা করলাম। মাঘ মাসের শীতের মধ্যে শিশিরে ভেজা জামা-কাপড় নিয়ে গাছ তলার মাটিতেই কম্বল বিছিয়ে শুতে হ'ল। এতদিন বালিশের কাজটা সেরেছিলাম চিড়ার ব্যাগটি শিয়রে দিয়ে। কিন্তু আজ আর চিড়া ভর্তি ব্যাগ নাই। তাই বালিশের অভাব দেখা দিল। কাছেই একটা কাষ্ঠের দোকান ছিল। দোকানীকে ডেকে তার অনুমতি নিয়ে এক আটি (ব্যান্ডেল) কাষ্ঠ আনলাম এবং গরুর রশি কোমরে বেঁধে কাষ্ঠের আটি শিয়রে দিয়ে শুয়ে থাকলাম।

১৩ই মাঘ। ভোরে কাষ্ঠের আটিটা দোকানীকে ফেরত দিয়ে, খেওয়া পার হয়ে পথ চলতে শুরু করলাম। অনাহারে অবিশ্রাম চলে সন্ধ্যার অল্প আগে এসে পুঁছলাম বাড়ীতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিখারীর আত্মকাহিনী

পঞ্চম খন্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ক্ষেত্র-ফল" রচনা

২৭/৫/৬৫-২৩/৫/৬৭

"কালিকষা" জানবার আবশ্যক নাই- এমন ধারণার লোক অল্পই আছে। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন মানুষই কৃষক এবং এদের প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু চাষের জমি আছে। সুতরাং ভূমির পরিমাপ ও পরিমাণ সম্বন্ধে সকলেরই কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রেও কালির আবশ্যক সর্বত্র। এক জন রাজমিস্ত্রিকে স্থির করতে হয়, একটি ইমারত গঠন করতে কি পরিমান ইঁট, বালি, সিমেন্ট আবশ্যক হইতে পারে। ইহা এক প্রকার কালি। একজন কামারকে জানতে হয়- একটি নির্দিষ্ট নক্সার জিনিষ তৈয়ার করতে কি পরিমান- সোনা, রূপা বা লোহা আবশ্যক হইবে। এক জন ব্যবসায়ীকে জানতে হয়- কত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট একটি গুদামে বা পাত্রে কি পরিমাণ মাল রাখা যাবে ইত্যাদি। ইহারা সবই এক এক রকম কালি। বস্তুত এমন কোন কাজ নাই, যার কোন রকম কালি নাই। তবে নানাবিধ কাজের হিসাব-নিকাশ বা বরাদ্দের জন্য নানাবিধ কালির আবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকার কালির জন্য বিভিন্ন প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু এরূপ মেধাবী মানুষ অল্পই আছেন, যাঁরা সকল রকম কালির সকল রকম নিয়ম স্মরণ রাখিতে পারেন। আবার প্রকৌশলীদের মত সূক্ষ্ম ও জটিল হিসাবাদিও সাধারণ মানুষ আয়ত্ব করিতে অক্ষম। এই উভয় সংকট এড়িয়ে সাধারণ মানুষ যাতে নিত্য আবশ্যকীয় কালি সমূহের সাধারণ নিয়মাদি জানিতে ও বুঝিতে পারেন, তার জন্য এক খানা পুস্তক লেখার পরিকল্পনা আমার বহুদিন হতেই ছিল। অতি সাধারণ লেখা-পড়া জানা লোকও পুস্তক খানা দেখে যাতে স্বকার্য সাধন করিতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে উহা প্রণয়নের কাজে হাত দিলাম বিগত ২৭/৫/৬৫ তারিখে এবং উহা সমাপ্ত হ'ল ২৩/৫/৬৭ তারিখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুস্তক খানার নাম রাখা হয়েছে- "সরল ক্ষেত্র-ফল" বা "কালিকষা"। উহার পাণ্ডুলিপি খানা ৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ সংযোজিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

(ক্ষেত্র পরিচয়)

সরল রেখা

সমকোণ

সমতল

বৃত্ত বা চক্র

লম্ব

অতিভূজ

বৃত্তাভাস

চাপ

ত্রিভুজ

চতুর্ভুজ

বহুভুজ

বর্তুল

বর্তুলাভাস

সূচী

স্তম্ভ

ঘনক্ষেত্র

অঙ্গুরীয় ক্ষেত্র

বলয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্গ ও ঘন

(বর্গ পরিমান নির্ণয়ের নিয়মাবলী)

ত্রিভুজ ক্ষেত্র

চতুর্ভুজ ক্ষেত্র

বহুভুজ ক্ষেত্র

বৃত্ত ক্ষেত্র

অঙ্গুরীয় ক্ষেত্র

বৃত্তভাস ক্ষেত্র

চাপক্ষেত্র

বর্তুলের পৃষ্ঠ দেশের বর্গ পরিমাণ

সূচীর পৃষ্ঠ দেশের বর্গ পরিমাণ

স্তম্ভের পৃষ্ঠ দেশের বর্গ পরিমাণ

বলয়ের পৃষ্ঠ দেশের বর্গ পরিমাণ

(ঘন পরিমাণ নির্ণয়ের নিয়মবলী)

চতুর্ভুজ ক্ষেত্র

ত্রিভুজ ক্ষেত্র

সূচীর ঘন পরিমাণ

বর্তুলের ঘন পরিমাণ

স্তম্ভের ঘন পরিমাণ

কুপের ঘন পরিমাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

(বর্গ-পরিমাণ ও স্থানীয় এককের সম্মিলন)

(বর্গনল) বিঘা

(বর্গনল) কালি

(বর্গ হাত) বিঘা

(বর্গ হাত) কালি

(বর্গ হাত) একর

(বর্গ ফুট) বিঘা

(বর্গ ফুট) কালি

(বর্গ ফুট) একর

(বর্গ লিংক) বিঘা

(বর্গ লিংক) কালি

(বর্গ লিংক) একর

(ঘন পরিমাণ ও স্থানীয় এককের সম্মিলন)

ঘন হাত

ঘন ফুট

(একাবলী)

রৈখিক পরিমাপের একাবলী

স্থানীয় এককের একাবলী

বর্গ পরিমাপের একাবলী

ঘন পরিমাপের একাবলী

বর্গ ও ঘন পরিমাণকে স্থানীয় এককে পরিণত নিয়ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়

(আর্যার সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয়)

কড়া ও কালি কালি

একর = শতাংশ কালি

বিঘা-কাঠা কালি

মাটি কালি (বড় কুয়া)

মাটি-কালি ছোট কুয়া

পঞ্চম অধ্যায়

গড় নির্ণয়

(একর- শতাংশের সহিত স্থানীয় মাপের সম্মিলনী) বিঘা

(একর- শতাংশের সহিত স্থানীয় মাপের সম্মিলনী) কালি

অনির্দিষ্ট-রাশি নির্ণয়

আপেক্ষিক গুরুত্ব

ঘন পরিমাণ হইতে ওজন নির্ণয়

মিশ্রিত দুই পদার্থের

প্রত্যেকের ওজন নির্ণয়

আলোচ্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপি খানা বরিশাল ব্রজ মোহন মহাবিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সুখেন্দু সেন মহাশয় পাঠ করে উহার ভ্রমাদি সংশোধনের প্রয়াস পেয়েছেন (৯/৯/৬৭)। অর্থাভাবে পুস্তক খানা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। উহার দুখানা পাণ্ডুলিপি আমার "গ্রন্থমালা" এ রক্ষিত আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেট বাটারা

১৩৬৬

কোন মানুষই তার মৃত্যুর তারিখ জানে না। কিন্তু তীর্থ যাত্রীরা তাদের মৃত্যুর একটা তারিখ ধার্য করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের সংসারের জরুরী কাজ কর্ম সমাধা ও দেনা-পাওনা পরিশোধ করে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তীর্থযাত্রা করেন। আবার সে ফিরে আসুক, বাঁচুক সে আরো দশ বছর, কোন ক্ষতি নাই।

প্রকৃতি রাজে "অনিবার্য সত্য" হচ্ছে এক মাত্র "মৃত্যু" কিন্তু এই একান্ত সত্যটিকে হাতে নিয়েও মানুষ তার পরমায়ুকে অনুভব করে "অসীম" বলে। কেননা সে তার পরমায়ুর সীমা দেখতে পায় না। কাল্পনিক হলেও যদি (তীর্থ যাত্রীর মত) পরমায়ুর একটা সীমারেখা টানা যায়, তবে সেটা সংসারীর পক্ষে হয় মঙ্গল জনক যেহেতু এতে সংসারী বাসিরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের শুভ কাজ গুলো সম্পন্ন করবার ও অশুভ কাজ হতে বিরত থাকবার গরজ অনুভব করে আমি মনে করি। তাই আমি আমার পরমায়ুর সীমারেখা পাবার জন্যে চিন্তা করতে লাগলাম এবং একটা উপায়ও বের করলাম।

আমার পূর্ব পুরুষদের পাঁচ পুরুষের মধ্যে দশ ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ধরে তাঁদের পরমায়ুর একটা গড় বের করলাম। উহাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ছিল ৩২-৮০ বছর। কিন্তু সবাইর বয়সের গড় পাওয়া গেল মাত্র ৬০ বছর। তাই আমিও আমার পরমায়ুর পরিমাণ মনে করে নিলাম ঐ রূপই এবং সে হিসাবে আগামী ১৩৬৭ সালে আমার মহাতীর্থ-যাত্রার কথা।

সাধারণতঃ- শৈশবে মানুষের মন থাকে আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু উহা প্রৌঢ়ে হয়ে দাঁড়ায় বংস কেন্দ্রিক। তখন মানুষ তার নিজের চেয়ে সন্তান-সন্ততীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই চিন্তা ও চেষ্টা করে বেশী এবং উহা আমিও করে থাকি।

পরমায়ুর হিসাবটি পাবার পর হতে আমি আমার সংসার পরিচালনার যাবতীয় কাজ কর্ম করে আসছি উক্ত হিসাব ধরেই। জরুরী কাজ গুলোর মধ্যে এখনও বাকি রয়েছে- ছেলেদের মধ্যে আমার সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়া। উহা জরুরী এই জন্য যে, দেখা যাচ্ছে অনেক বিত্তবান প্রতিভাশালী ব্যক্তি আজীবন অন্য লোকের বিবাদ মিটিয়ে কালাতিপাত করেছেন অথচ তাদের অবর্তমানে- তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে তদীয় সন্তানরা- ঝগড়া-কলহও মামলাদি সৃষ্টি করে সম্পত্তি নষ্ট এবং নানা রূপ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে। ঐ রূপ অনাচার হতে সন্তানদের রক্ষাকল্পে আমি আমার স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি ১৩৬৭ সালের পূর্বে নিজ হস্তে সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। পর পর্যায়ে সাব্যস্ত করলাম আমি অবর্তমানে আমার ওয়ারিশগণ ফরায়েজ মতে যে হারে অংশ প্রাপ্ত হবে, সেই অংশ মোতাবেক আমি আমার সম্পত্তি বন্টন করে দেব। তবে আমার দুই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বলে ওদের পক্ষ হবে দুটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময় আমার ওয়ারিশদের ফরায়েজ মতে অংশ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম পক্ষ		দ্বিতীয় পক্ষ	
স্ত্রী লালমনেছা	এক আনা	স্ত্রী সুফিয়া খাতুন	এক আনা
পুত্র আঃ মালেক (নয়া)	দুই আনা ষোল গন্ডা	পুত্র আঃ খালেক (মানিক)	দুই আনা ষোল গন্ডা
কন্যা ফয়জন্নেছা	এক আনা আট গন্ডা	পুত্র আঃ বারেক (কাঞ্চন)	দুই আনা ষোল গন্ডা
	মোট পাঁচ আনা চার গন্ডা	কন্যা মনোয়ারা বেগম (কুসুম)	এক আনা আট গন্ডা
		কন্যা নূরজাহান বেগম (বকুল)	এক আনা আট গন্ডা
		কন্যা বিয়াম্মা বেগম (মুকুল)	এক আনা আট গন্ডা
			মোট দশ আনা ষোল গন্ডা

(১) ১৩৬৬ সালের ১১ই ভাদ্র। বেলা ২টায় স্থানীয় আমিন আলী সিকদার ও আমার ওয়ারিশগণকে নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হলাম (আমার বসতঘরে)।

পক্ষদ্বয়ের প্রাপ্য অংশ যথাক্রমে পাঁচ আনা চার গন্ডা ও দশ আনা ষোল গন্ডা। ইহা সমান ১/৩ ও ২/৩ হতে সামান্য কম বা বেশী। কিন্তু যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি যথা - ধান, চাল, তিল, মরিচ, পাট, তামাক ইত্যাদি ফসল, পাতিল, হাড়ি, আইট, মটকী, রেকাবী, গ্লাস ইত্যাদি পাত্র এবং গৃহ সরঞ্জামাদি; প্রথম পক্ষকে ১/৩ ও দ্বিতীয় পক্ষকে ২/৩ অংশ দেওয়া হ'ল।

বর্ষাকাল হেতু ভূসম্পত্তি বন্টন করা হ'ল না। তবে স্থির হ'ল যে, বর্তমান ফসল তুলে উহা পক্ষদ্বয়ের অংশানুযায়ী ভাগ করে দিয়ে পরের সুখনা মৌসুমে জমি বন্টন করে দেওয়া হবে। তবে সিদ্ধান্ত করা হল যে, ভূসম্পত্তি বন্টন করা হবে নির্ধারিত অংশ মতেই। তবে প্রতি খন্ড জমি ঐ রূপ অংশ মতে বন্টন করার ঝামেলা এড়াবার জন্যে ২৭৬ নং খঃ ১৫৫৯ নং দাগ বাদে সমস্ত জমি ১/৩ ও ২/৩ অংশ হিসাবে বন্টন করা হবে এবং এতে- প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে সেই পরিমাণ জমি বেশী ও কম হবে, ১৫৫৯ নং দাগের জমির অংশ পরিবর্তন করে তা সমান করা হবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মতে যাবতীয় ভূসম্পত্তির এক প্রস্থ বাটারার নকসা, ফিল্ডবুক ও চিঠা তৈরী করে দেওয়া হল। পক্ষদ্বয় এই নক্সা ও ফিল্ড বুক দৃষ্টে জমি বন্টন ও চিঠা দৃষ্টে ভোগ দখল করিবে বলে সাব্যস্ত হ'ল। বন্টন কাজ ও আলোচনা শেষে- স্থাবরাস্থাবর আমার যাবতীয় সম্পত্তির পূর্ণ তালিকা সহ ১৪ দফে শর্ত যুক্ত এক খানা "স্মারকলিপি" লিখে দিলাম। লিপি খানা ৪০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত (উহা আমার "গ্রন্থমালা" এ রক্ষিত আছে)। বিশেষতঃ প্রত্যেক পুত্রকে উক্ত স্মারকলিপির একখানা করে অনুলিপি যত্নের সহিত রাখতে বলা হল। ঐ স্মারকলিপি খানার কিছুটা অংশ এখানে লেখলাম।

"বরাবরে – ১ম পক্ষ আঃ মালেক (নয়া)

– ২য় পক্ষ (ক) আঃ খালেক (মানিক)

(খ) আঃ বারেক (কাঞ্চন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তোমাদের বৃদ্ধ পিতা। বর্তমানে আমি স্বাস্থ্যহীন এবং সাংসারিক কার্য পরিচালনে অক্ষম। হয়ত মৃত্যুও বেশী দূরে নয়। তাই তোমাদের কল্যাণ কামনায় আমার স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তোমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভক্ত করিয়া তাহার পরিচালনের ভার তোমাদের উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অর্পণ করিলাম। তোমরা আমার নিম্ন লিখিত আদেশ ও উপদেশ মতে নিজ নিজ স্টেট পরিচালনা করিবা। ইতি ১৩৬৬ সাল তাং ১১ই ভাদ্র।

আদেশাবলী

১। আমার বর্তমান স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তোমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলাম। ইহার আয়ের দ্বারা- (ক) তোমাদের স্ব স্ব মাতা ও ভগ্নিদের ভরণ-পোষন এবং তত্ত্বাবধান করিবা। (খ) জমির হাল-বকেয়া খাজনা পরিশোধ করিবা। (গ) আমার নিজ নামীয় (অদ্য হইতে পূর্ববর্তী) যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করিবা। (ঘ) আমার জীবিত কাল পর্যন্ত-খোরাক ও পোষাক, রোগের চিকিৎসা এবং মরণান্তে যথারীতি সৎকার করিবা।

২। আমার স্ত্রী ও কন্যাগণের দায়ীকৃত সম্পত্তি ও তোমাদের হস্তে অর্পণ করিলাম। ইহা তোমরা তাহাদের সন্তুষ্টী বিধানে ভোগ দখল করিতে পারিবা। নচেৎ স্বেচ্ছায় তাহাদের অংশের সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিবা।

৩। তোমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে ভবিষ্যতে আমার কোন ওয়ারিশ জন্ম বা মৃত্যু হইয়া অত্র বাটারার কোন পরিবর্তনের কারণ হইলে "তৎপরি-প্রেক্ষিতে তোমরা অত্র বন্টন পরিবর্তন করিতে বাধ্য থাকিবা। কিন্তু জমির বাটারা ঠিক রাখিয়া শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের জমির সীমানা পরিবর্তন করিয়া উহার মিমাংসা করিবা। " ইত্যাদি।

পরবর্তি মাঘ মাসে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সরেজমিন বন্টন করে দেওয়া হল। কিন্তু জমির সত্ব ও সত্বরক্ষার দায়িত্ব আমারই থাকল। বিশেষতঃ আমার কোন কাজ করবার বা না করবার ও নিজ উপার্জিত অর্থ ব্যয় করবার অধিকার থাকল আমারই। আমি প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে প্রত্যেক মাসে ১০ ও ২০ দিন করে পান-ভোজন করতে লাগলাম (১৩৮০ সাল পর্যন্ত)।

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী ২৯/৮/৭৬ আষাঢ়ে মৃত্যু হওয়ায় তার এক আনা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রাপ্য হয়। এবং ১৩৮০ সাল থেকে উহা দ্বিতীয় পক্ষকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে প্রথম পক্ষের অংশের পরিমাণ হয় মোট চার আনা চার গন্ডা ও দ্বিতীয় পক্ষের মোট এগারো আনা ষোল গন্ডা। অধিকন্তু দ্বিতীয় পক্ষের আঃ খালেক (মানিক) ও আঃ বারেক (কাঞ্চন) ১৩৮০ সালে ভিন্ন হয়ে যায়। এতে আঃ মালেক ও আঃ বারেক-এর প্রত্যেকে ১৩৮০ সাল হতে আমার পানাহার চলছে উক্ত অংশ দ্বারাই। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– প্রথম পক্ষের আঃ মালেকের সাথে ৮ রোজ এবং দ্বিতীয় পক্ষের আঃ খালেক ও আঃ বারেকের সাথে প্রায় ১১ রোজ করে।

"সৃষ্টি-রহস্য" রচনা

১৩৭২-১৩৭৭

"নানা-মুনির নানা মত", এটা শুধু প্রবাদ বাক্য নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু উহা কেন। কেন ধর্মে ধর্মে মতানৈক্য চিরকাল। হজরত ঈসা বললেন- কেহ তোমার এক গালে চড় মারলে তুমি তাকে অন্য গালও পেতে দাও, হজরত মুসা বললেন- চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, জীবনের বদলে জীবন লও। ইসলাম ধর্ম পরমেশ্বরের গুনকীর্তনে মুখর, আবার বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই। দার্শনিকরাও দু শ্রেণীতে বিভক্ত- আস্তিক ও নাস্তিক। আবার কেউ বলেন- জগত সত্য এবং কেউ বলেন- জগত অলিক বা মায়া। বিজ্ঞানী নিউটনের মতে- জগতের সর্বত্র বিরাজ করে এক মহাকর্ষ শক্তি। কিন্তু পরম বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেন- "মহাকর্ষ" কোন একটা শক্তিই নয়।

বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, একই বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার করে গেছেন মনিষীরা, যাতে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত, সত্যাসত্য নির্ণয় করা হয় দুরুহ। কিন্তু একই বিষয়ে মতবাদের সংখ্যা যতটাই হোক না কেন, উহার মধ্যে সত্য কিন্তু একটাই। মানুষ চায় সেই "এক" এর সন্ধান। অর্থাৎ "সত্যের সন্ধান"। সেই একের সন্ধান করতে গিয়ে আমার মনে উদয় হচ্ছে কত গুলো প্রশ্ন। কিন্তু তাতে শান্তি পাই নাই। কেননা শান্তি প্রশ্নে থাকে না, থাকে উত্তরে। অর্থাৎ প্রশ্নে থাকে উৎকন্ঠা, উত্তরে স্বস্তি।

আমি স্বস্তি লাভের আশার চিন্তা করতে গিয়ে দেখেছি যে, কোন বিষয়ের সত্যাসত্য যাচাই করতে হলে তার মূল তত্ত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি তত্ত্ব জানা আবশ্যক। আবার কোন "একটা" বিশেষ বিষয় সৃষ্টির পূরাপূরি তত্ত্ব জানা সম্ভব নয়। কেননা জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ই একে অন্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। তাই সামগ্রিক ভাবে সত্যের সন্ধান করতে হলে জানবার আবশ্যক হয়- বিশ্ব-সৃষ্টি-তত্ত্ব। তাই আমি উহা জানবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সেখানেও সেই একই অবস্থা। অর্থাৎ সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে মতবাদের বাহুল্য। সত্যাসত্য মানব গোষ্ঠির মধ্যে সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ মতের এতই ছড়াছড়ি যে, তার কোনটাকেই "সৃষ্টি তত্ত্ব" বলে গ্রহণ করা যায় না- সব মিলে হয়ে পড়ে একটা "সৃষ্টি-রহস্য"। "সত্যের সন্ধান" এর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে এক খানা পুস্তক লেখবার ইচ্ছা আমার বহুদিন থেকে ছিল এবং ঐ সম্বন্ধে কত গুলো মতবাদ জানবার সুযোগও পেয়েছিলাম। সে সমস্ত সংযোজিত করে এক খানা পুস্তক লেখলাম। কিন্তু উহা সামগ্রিক ভাবে "সৃষ্টি-তত্ত্ব" নয়, "সৃষ্টি-রহস্য"। তবে উহাতে আলোচিত মতবাদ গুলো মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করলে সুধী পাঠক কৃতদয়ের কাছে "সৃষ্টি-তত্ত্ব"টা অবোধ্য থাকবার কথা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সৃষ্টি-রহস্য" পুস্তকখানা বিগত ১৯/৪/৭২ তারিখে রচনা শুরু করে শেষ করেছি ২৫/৪/৭৭ তারিখে। উহার পাণ্ডুলিপি খানা বরিশাল ব্রজ মোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় কাজী গোলাম কাদির সাহেব ও মাননীয় অধ্যাপক শামসুল হক সাহেব পাণ্ডুলিপি খানার যাবতীয় ভ্রম সংশোধনের প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব কবীর চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনিরুজ্জামান মিঞা পাণ্ডুলিপি খানা পাঠ করেছেন এবং স্ব স্ব অভিমত প্রদান করেছে। প্রকাশক অভাবে পুস্তক খানা এখনো প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। উহার তিন খানা কপি আমার "গ্রন্থমালা" এ রক্ষিত আছে।

"সত্যের সন্ধান" এর পাণ্ডুলিপি

১৩৫৭ -১৩৫৮

এ যাবত প্রশ্ন গুলোর তত্ত্বগত মূল্য সম্বন্ধে আমি সন্দিহান থাকায়, এ নিয়ে সুধী সমাজের কোন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করছি। কিন্তু উহা অনেকটা কেটে গেল, যখন এস, পি, মহিউদ্দিন সাহেব আমার প্রশ্ন গুলোকে "বাহুল্য প্রশ্ন" বলে আখ্যায়িত করলেন না। তৎপরে তালিকা খানা অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেবকে দেখতে দিয়ে ওগুলো সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম (৩/২/৫৯)। তিনি পরবর্তি ৭/২/৫৯ তারিখে বেলা ৩টায় বরিশাল মটর এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার জন্যে বসবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

নির্দিষ্ট (৭/২/৫৯) সময়ে যথাস্থানে আলোচনা শুরু হল এবং কাজী সাহেব উৎসাহের সহিত ৩-৫-৩০টা পর্যন্ত আলোচনা করলেন। অতঃপর উভয়ে একত্র হয়ে বেলস্ পার্কে গেলাম ফুটবল খেলা দেখতে। কিন্তু কার্যতঃ খেলা দেখা হ'ল না। রাস্তার পার্শ্বস্থ পান্থ-আসনে উপবেশন করে বিবিধ আলোচনায় সন্ধ্যা ৭টা বেজে গেল। স্থির হল আগামী ১০/২/৫৯ তারিখে পুনঃ আলোচনা হবে।

নির্ধারিত (১০/২/৫৯) তারিখে রাত ৭টায় কাজী সাহেবের বাসায় বসে পুনঃ আলোচনা শুরু হয়ে ১০-৩০টা পর্যন্ত আলোচনা চল্‌লো। তিনি আমাকে- কয়েকটি প্রশ্ন বাদ দিতে, কয়েকটি নতুন প্রশ্ন সংযোজন ও কতিপয় শব্দ পরিবর্তনের উপদেশ দিলেন।

কাজী সাহেবের উপদেশ মতে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে উহা পুনঃ তাঁকে দেখতে দিলাম (১১/৩/৫৯)। আমার লিখিত প্রশ্ন গুলোর শ্রেণী বিভাগ ও কোন রূপ শৃঙ্খলা ছিল না। তিনি এলো-মেলো প্রশ্ন গুলোর শ্রেণী বিভাগ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে লেখতে উপদেশ দিলে আমি সে কাজটির জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালাম এবং তিনি তাতে সানন্দে সম্মত হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪/৩/৫৯ তারিখে ১৮ই আষাঢ় আমি পাণ্ডুলিপি খানা ফেরত আনতে কাজী সাহেবের বাসায় গেলে তিনি আমাকে বললেন যে, প্রশ্ন গুলোর শ্রেণী বিভাগ ও শৃঙ্খলা সহকারে একখানা স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি তিনি লেখতে শুরু করেছেন। তবে লেখা এখনো শেষ হয় নাই। অতঃপর "সত্যের সন্ধান" বই খানার ছাপা খরচ জানবার জন্য কাজী সাহেবকে নিয়ে গুলিস্তান প্রেসে গেলাম এবং প্রেসের ম্যানেজার সাহেবের নিকট উহার হিসাব চাহিলে তিনি নিম্নরূপ হিসাব দিলেন।

(১)	ছাপা (নিউজ প্রিন্ট) ১৮.৫ রিম ১৬ টাকা দরে	২৯৬.০০
(২)	ছাপা খরচ (৫ ফরমা) ২৫ টাকা দরে	১২৫.০০
(৩)	মলাট ছাপা	১০.০০
(৪)	বাইণ্ডিং	২০০.০০
	মোট টাকা	৬৩১.০০

২০/৪/৫৯ তারিখে কাজী সাহেব তাঁর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি খানা আমার হাতে দিলেন। তিনি প্রশ্ন গুলোকে ছয়টি প্রস্তাবে বিভক্ত করেছেন। যথা- আত্মা বিষয়ক, ঈশ্বর বিষয়ক, পরকাল বিষয়ক, ধর্ম বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক ও বিবিধ। মোট প্রশ্ন সংখ্যা ৫৭টি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২।

বয়স পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং তৎসঙ্গে পরিবর্তন ঘটে মনেরও। তাই কালান্তরে মানুষ নিজের কৃতকর্মকে নিজেই "ভ্রমাত্মক" বলে মনে করে। "সত্যের সন্ধান" এর পাণ্ডুলিপি আমার ঘরে পড়ে ছিল প্রায় বিশ বছর। প্রায়ই সময় সময় কিছু কিছু নতুন প্রশ্ন মনে উদিত হয়েছে এবং কোন কোন পুরোনো প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা মরচে ধরা মনে হওয়ায় উহা ঘষা-মাজার আবশ্যকতা অনুভূত হয়েছে। কাজেই পূর্বের লিখিত পাণ্ডুলিপিতে উহার সংশোধন সম্ভব না হওয়ায় স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি লেখতে হয়েছে। এভাবে পরিবর্তন করতে করতে ১৩৫৭-১৩৭৮ সাল পর্যন্ত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা হচ্ছে ১৪ খানা। পর পাতায়ে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

পাণ্ডুলিপিসমূহ

ক্রমিক সংখ্যা	লেখার তারিখ	প্রশ্ন সংখ্যা	পৃষ্ঠা সংখ্যা	লেখক
১ম	১০/৯/৫৭	৪০	১	ইয়াছিন আলী সিকদার(টাইপিস্ট)
২য়	১২/২/৫৮ -১৬/২/৫৮	৫৩	১০	ইয়াছিন আলী সিকদার(টাইপিস্ট)
৩য়	২৯/২/৫৮ - ২২/৩/৫৮	৫৭	৬০	ইয়াছিন আলী সিকদার(টাইপিস্ট)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪র্থ	১১/৩/৫৯ - ২০/৪/৫৯	৫৭	৮২	কে, জি, কে।
৫ম	৯/১১/৬২ - ২৬/১১/৬২	৬১	১২৭	খোদ
৬ষ্ঠ	২১/১২/৬২ -৪/১/৬৩	৬১	১২৯	খোদ
৭ম	৫/৩/৬৮ -২৬/৪/৬৮	৬১	১৪০	আঃ খালেক (মানিক)
৮ম	১২/১/৭২ - ৪/২/৭২	৬৬	১৬৮	খোদ
৯ম	২৮/৪/৭৩ -২০/৬/৭৩	৬৬	১৯৩	খোদ
১০ম	৮/১০/৭৩ -২২/১০/৭৩	৬৩	২০৮	খোদ
১১শ	৬/৪/৭৪ - ২২/৪/৭৪	৬৬	১০৪	(লুজ সীট)
১২শ	২১/৪/৭৬ -১/৫/৭৬	৬৬	১০৪	(লুজ সীট)
১৩শ	৬/৯/৭৭ - ৬/১০/৭৭	৬৬	২০২	(লুজ সীট)
১৪শ	২৬/৭/৭৮ - ৩/১১/৭৮	৬৭	২০৭	(প্রেস কপি)

উক্ত পাণ্ডুলিপি সমূহের মধ্যে ৭ম সংখ্যক পাণ্ডুলিপি খানা জনৈক মৌলুবী সাহেব পড়তে নিয়ে আর ফেরত দেন নাই। ১১শ সংখ্যক (লুজশিট) পাণ্ডুলিপি খানা - পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব আঃ বারীর কথিত মতে তার এক (কলকাতা বাসী) বন্ধুর কাছে পাঠাবার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। কিন্তু বরিশাল বি, এম, কলেজের অধ্যাপক আঃ রশিদ সাহেব উহা পড়তে নিয়ে হারিয়ে ফেলেন। অগত্যা আর একখানা পাণ্ডুলিপি (লুজ সিট ১২শ সংখ্যক) লিখে বারী সাহেবকে দেওয়া হয় এবং তিনি উহা কলকাতা পাঠান। তবে বারী সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় ও বিষয় আর কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। প্রায় দুবছর পরে অধ্যাপক আঃ রসিদ সাহেবের হারানো (১১শ সংখ্যক) পাণ্ডুলিপি খানা মাননীয় অধ্যাপক শামসুল হক সাহেব কোন সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে উহা আমাকে ফেরত দিয়েছেন। ১৩শ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি খানা অভিমত প্রাপ্তির জন্যে বিগত ২২/১১/৭৮ তারিখে বাংলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব কবীর চৌধুরীকে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি স্বীয় অভিমত সহ উহা ২৮/৬/৭৯ তারিখে ফেরত দিয়েছেন। ১৪শ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি খানা- "সত্যের সন্ধান" এর ছাপা কাজের জন্য বরিশাল আল আমিন প্রেসে প্রদত্ত হয়েছে। এক্ষনে পাণ্ডুলিপি সমূহের মধ্যে ১ম-৬ষ্ঠ, ৮ম-১১শ এবং ১৩শ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি আমার "গ্রন্থ-মালা" এ "রক্ষিত আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যের সন্ধান প্রকাশ

১৩৭৯-১৩৮২

প্রায় বাইশ বছর পূর্বের রোপিত আমার এক পাতার শিশু বৃক্ষটি এখন বেশ বড়সড় হয়েছে, শাখা-প্রশাখা ও পাতা-পল্লব প্রচুর জন্মেছে। কিন্তু ফলন্ত হল না এখনো। আজ পর্যন্ত কোন মানুষকে তার ফলের এক ফোটা রসও আস্বাদন করতে দিতে পারি নাই। তাই মনে অতিশয় বেদনা।

"সত্যের সন্ধান" এর এক পাতার পাণ্ডুলিপি খানা এখন দু-শ পাতার উর্ধে উঠেছে। (১) কিন্তু প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না কারণ আমার অর্থাভাব। সে অভাব কিছুটা পূরণ করার জন্য এগিয়ে আসলেন মহানুভব অধ্যাপক শরফুদ্দিন রেজা হাই সাহেব। তিনি পুস্তক খানা প্রকাশের জন্য স্বেচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে এক হাজার টাকা সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন (২৪/৩/৭৯)। মাননীয় হাই সাহেবের সাহায্যের উপর ভরসা রেখে পুস্তক খানা প্রকাশ করতে মনস্থ করলাম।

১০ই শ্রাবণ, ১৩৭৯। "সত্যের-সন্ধান" পুস্তক খানা ছাপতে দেওয়ার জন্য বরিশাল গেলাম এবং অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক সাহেব ও অধ্যাপক বাকের আলী সাহেবকে ডেকে আনলাম আল আমিন প্রেসে। তাঁরা আমার পক্ষ হয়ে প্রেস কর্তৃপক্ষ মোঃ আঃ জব্বার মিঞা ও মোঃ সেকান্দার আলী মিঞার সাথে আলাপ আলোচনা করে নিম্নলিখিত হিসাব অনুযায়ী সং ১০০.০০ টাকা নগদ দিয়ে "সত্যের সন্ধান" বই খানা ছাপতে অর্ডার লিখিয়ে দিলেন।

(খরচ)

(১)	কাগজ	৭০০.০০
(২)	মলাটের কাগজ ও ছাপা	৬০.০০
(৩)	ছাপা খরচ	৪০০.০০
(৪)	বাইন্ডিং	১০০.০০
	মোট টাকা	১২৬০.০০

প্রেসের কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি থাকে যে, আগামী ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ) মাসের মধ্যে বইয়ের ছাপা কাজ সমাধা করে দিবেন। কিন্তু নানা অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা এতই শৈথিল্য করতে লাগলেন যে, মাঘ মাসের প্রথম ভাগেও ছাপা কাজ শুরুই করলেন না।

১৯ শে মাঘ, ১৩৭৯। বেলা ১২টায় আমি প্রেসে গেলে প্রেসের ম্যানেজার সেকান্দার আলী মিঞা আমাকে বললেন যে, আজ আমার বইয়ের ছাপা-কাজ শুরু করা হবে। সুতরাং কিছু আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন। আমি সহর্ষে সম্মতি জানিয়ে তাঁকে বললাম- আপনার ও কর্মচারী বৃন্দের অভিরুচি মত অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। ব্যয় ভার সব আমার। আমি কলেজে গিয়ে অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব ও অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক সাহেবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিমন্ত্রণ জানালাম এবং কলেজ ছুটির পর তাঁদের নিয়ে প্রেসে আসলাম। "সত্যের সন্ধান" পুস্তকের "মূল কথা" এ লিখিত "অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন" এই প্যারাটি কম্পোজ করে ছাপিয়ে আমাদের সামনে দেওয়া হলে সবাই উহা সানন্দে পাঠ করলাম। অতঃপর চা-মিষ্টি ভোজনান্তে ছাপা কাজের অনুষ্ঠান পর্ব শেষ করলাম। নিরানন্দ মনের এক কোনে আজ কিছু আনন্দ নিয়ে রাত্রে বাড়ীতে এলাম।

বইয়ের ছাপা কাজ শুরু হলে কি হবে, প্রেসে অন্যান্য কাজ যথেষ্ঠ হচ্ছে কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে না। আমার কাজে এতই গরিমসি চলতে লাগল যে, ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত ছাপা হল মাত্র ৮টি ফরমা (আট পেজী)। ওদিকে জিনিষ পত্র মূল্য হু হু করে অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পেয়ে গেল। একদা প্রেসের ম্যানেজার সাহেব বল্লেন- "কাগজ, কালি, টাইপ ইত্যাদির মূল্য বাড়ছে; ঘর ভাড়া, লাইট ভাড়া সবই বাড়ছে এবং বাড়াতে হচ্ছে কর্মচারীর বেতনও। সুতরাং এখন আপনার সাবেক বরাদ্দে আর কাজ করা যাবে না। তিনি নুতন করে একটা হিসাব দিলেন।

(১)	কাগজ	[illegible].০০
(২)	ছাপা খরচ	৯২০.০০
(৩)	কভারের কাগজ	৫০.০০
(৪)	কভার ছাপা	২০.০০
(৪)	বাঁধাই	৬০০.০০
(অতিরিক্ত)	ব্লক-ডিজেইন	২১৫.০০
	মোট টাকা	৩৫০৫.০০

AMARBOI.COM

সন্তান-সন্ততী

আমার দুই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততী দশটি। এর মধ্যে প্রথমা স্ত্রী লালমন নেছার গর্ভজাত চারটি ও দ্বিতীয়া স্ত্রী সুফিয়া খাতুনের গর্ভজাত ছ'টি। লালমন নেছার গর্ভজাতঃ-

(১) কন্যা এশারন নেছা। জন্ম ১১ই চৈত্র ১৩৩৩। মৃত্যু ২২ই জ্যাষ্ঠ ১৩৩৭

(২) কন্যা ছালেমান নেছা। জন্ম ১০ ফাগুণ- ১৩৩৫। মৃত্যু ১২ কার্তিক ১৩৪১

(৩) পুত্র আঃ মালেক। জন্ম ২ অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

(৪) কন্যা ফয়জনেছা। জন্ম ৭ কার্তিক ১৩৪৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়া স্ত্রী সুফিয়া খাতুনের গর্ভজাতঃ-

(১) কন্যা হাজেরা খাতুন। জন্ম ১২ ভাদ্র ১৩৪৩। মৃত্যু ৪ বৈশাখ ১৩৪৪

(২) পুত্র আঃ খালেক (মানিক)। জন্ম ১৯ বৈশাখ ১৩৪৫

(৩) পুত্র আঃ বারেক (কাঞ্চন)। জন্ম ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

(৪) কন্যা মনোয়ারা বেগম (কুসুম) জন্ম ১১ কার্তিক ১৩৫১

(৫) কন্যা নূর জাহান বেগম (বকুল) জন্ম ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৫৫

(৬) কন্যা বিয়াম্মা বেগম (মুকুল) জন্ম ২ বৈশাখ ১৩৬০

উপরোক্ত সন্তান সন্ততীগন সবাই বিবাহিত এবং প্রত্যেকেই এখন বাবা-মা। উহাদের জীবিত ছেলে মেয়ের সংখ্যা নিম্ন রূপ-

আঃ মালেক (নয়া) এর	২ পুত্র	২ কন্যা
আঃ খালেক (মানিক) এর	১ পুত্র	
আঃ বারেক (কাঞ্চন) এর	২ পুত্র	২ কন্যা
	৫ পুত্র	৪ কন্যা
ফয়জ নেছা এর	পুত্র	কন্যা
মনোয়ারা খাতুন (কুসুম) এর	৪ পুত্র	
নূর জাহান বেগম (বকুল) এর	২ পুত্র	
বিয়াম্মা বেগম (মুকুল) এর	১ পুত্র	

AMARBOI.COM

ভূসম্পত্তি

আমার পিতার ভূসম্পত্তির মোট পরিমাণ ছিল ১২.০২ শতাংশ। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে আমার শৈশব কালেই উহার মধ্যে ৭.০২ শতাংশ ভূমি বাকি করে নীলাম হয়ে যায়। (১৩১৬) এবং অন্যান্য দেনার দায়ে ১.৫০ শতাংশ ভূমি বিক্রি করতে বাধ্য হন। অবশিষ্ট থাকে মাত্র ৩.৫০ শতাংশ ভূমি। কিন্ত স্বেচ্ছাকৃত ভাবে নীলামে দিয়ে উহার (১.৭৫ শতাংশ) অংশ ভূমি মোল্লা সাহেব তাঁর মাতা মেহেরজান বিবির বেনামীতে কর্য কবুলিয় দিয়ে নিজ সত্ব করে নেন এবং আমি নাবালক বিধায় আমার পক্ষ হয়ে মাতা সাহেবানী কুলিয়ত দিয়ে আনেন অবশিষ্ট ১.৭৫ শতাংশ ভূমি (১৩২০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উক্ত ১.৭৫ শতাংশ ভূমির মধ্যে- বাস্তু-বাগান ও বেড়-পুকুরাদির পরিমাণ .৩৬৫ শতাংশ এবং নাল জমি ১.৩৮৫ শতাংশ। এর মধ্য হতে আবার জমিদারের নালিশী ও বেনালিশী খাজানা পরিশোধের জন্য মাতা সাহেবানীকে (আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা হামজে আলী মাতুব্বরের কাছে) জায় সুদী বন্ধক রাখতে হ'ল (দু'শ টাকার দায়) ১.০০ একর জমি (১৩২৩)। সুতরাং ১৩২৬ সালে আমাকে কৃষি কাজ শুরু করতে হয়ে ছিল অবশিষ্ট মাত্র .৩৮৫ শতাংশ জমি নিয়ে। অতঃপর ১৩২৭ সালে আলোচ্য জায় সুদী জমি টুকু উদ্ধার করা হলে আমার নাল জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৩৮৫ শতাংশ। অর্থাৎ নাল বাস্তু মোট ১.৭৫ শতাংশ বা প্রায় এক কানি।

অতঃপর ১৩২৯- ১৩৭৯ সাল পর্যন্ত আমি অন্যান্য যে সমস্ত ভূসম্পত্তি উপার্জন করতে পেরেছি, এখানে তার একটা তালিকা দিলাম।

আমার নিজ উপার্জিত জমির পরিমাণ ২৩.৩০ শতাংশ। কিন্তু উহার সবটুকু জমিই বর্তমানে আমার অধিকারে নাই। কেননা- ১নং দফে হতে .৬০৫, ২নং দফের .৯৪, ৩নং দফের .৫৪ এবং ৬নং দফে হতে .২৬ একুনে ২.৮৮ শতাংশ ভূমি খানা ২০নং দফে .৫৩৫ দফের কারনে আমাকে বিক্রয় করতে হয়েছে এবং ১২ নং দফে হতে ১.৩৯, ১৪ নং দফে হতে .৮৩, ১৬ নং দফে হতে ২.২৮ ও ২০ নং দফে হতে ১.৫৪ একুনে ৫.৮৩ অংশ ভূমি পত্তরী কাঠী নিবাসী আঃ ছোমেদ খাঁ গং দুখানা ভাক্ত কবুলিয়তের অনুবলে ১০৩ (ক) ধারা মামলা করে অন্যান্য বহু লোকের জমি সহ আমার নামের রেকর্ড ভেঙে অসদুপায়ে রেকর্ড করায়ে নেয় (৪/৩/৪৮) এবং ঐ জমি বলপূর্বক দখল করে।

খান সাহেবদের উক্ত কবুলিয়ত দুখানা ছিল একান্তই বঞ্চনামূলক, ভাক্ত। আলোচ্য জমি সমূহ ছিল ১৬৬৭ নং প্রতাপপুর মৌজায় অবস্থিত, হাল রেকর্ডে (আর, এস) ঐ মৌজাটি ৯৪ নং লামচরি মৌজার সামিলে রেকর্ড হয়েছে। প্রতাপপুর মৌজাটির ০.৫ অংশের মালিক ছিলেন ১৭২০ নং তৌজির জমিদার মাধব পাশা স্টেট এবং ০.৫ অংশের মালিক ১৭২১-২২ নং তৌজির জমিদার লাহারাজা ষ্টেট (কেহ কেহ মনে করেন যে, মাধব পাশা ষ্টেট //$_{১০}$ আনির জমিদার এবং লাহারাজ ষ্টেট /$_{১০}$ আনির জমিদার ছিলেন। কথাটা সত্য। কিন্তু অংশটি "চন্দ্রদ্বীপ পরগনা" এর অংশ, কোন মৌজার অংশ নয়। তৌজির মালিক বা জমিদার দেয় ঐ হিসাব মতে পরগনা বাটারা করতে গিয়ে মৌজার অংশ যে কোন রূপ হতে পারে হয়ত বা কেহ কোনও মৌজা না পেতেও পারেন। চন্দ্রদ্বীপ পরগনার মালিক ছিলেন ১৭২০ নং তৌজির। জমিদার মাধবপাশা ষ্টেট ।। ১০, ১৭২১-২২ নং তৌজির জমিদার লাহারাজ ষ্টেট /$_{১০}$ এবং ১৭২৩ নং তৌজির জমিদার বর্মন ষ্টেট নং; একুন ১/। পরগনা বাটারায় ২৭২৩ নং বর্মন ষ্টেট প্রতাপপুর মৌজা আদৌ পায় নাই এবং মাধব পাশা ষ্টেট ও লাহারাজ ষ্টেট পেয়েছিল সমান অংশ)।

মাধব পাশা ষ্টেটের মালিক বাবু রাধ্যবয়ন ও হিরালাল তাঁদের ঐ মৌজার সম্যক ভূমিতে হরেন্দ্র নাথ বক্সী ও শোনাউল্লা হাওলাদারের কাছে ১৩২৬ সালের ৭ই আশ্বিন তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত কবুলিয়ত মূলে পত্তন করেন এবং তাঁরা বকসী মশায়ের নিকট হতে স্বহস্তে দাখিলা দিয়ে ঐ জমির খাজানা আদায় করেন প্রায় ৩০ বছর। অতঃপর মূল জমিদারগণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর পরে স্টেটের আমলা-কর্মচারীদের যোগাযোগে জমিদারদের স্থলবর্তিগণকে ঐ জমিতে পুনঃ দুখানা কবুলিয়ত দেন খান সাহেবরা ১৩৫৩ সালের ৩রা আশ্বিন তারিখে। এর বহুপূর্ব হতে আমরা উক্ত ভূমিতে হরেন্দ্র নাথ বক্সী গং ও লাহারাজ স্টেটে কবুলিয়ত প্রদানে খাজানা প্রদান পূর্বক জমি ভোগদখল করিতেছিলাম। বিশেষতঃ জমির দখল মোতাবেক আমাদের নামে (আর, এস) খানাপুরী রেকর্ড হয়েছিল। ভেবে পাওয়া যায় না যে, ১০৩ (ক) ধারার হাকিম ---- সাহেব কোন আইনের বলে (একই জমির উপর আরোপিত দু'দফে কবুলিয়তের মধ্যে) পিতার গৃহিত কবুলিয়তের পরিবর্তে পুত্রের গৃহিত কবুলিয়ত এবং ৩০ বছর আগের (৭/৬/২৬ তারিখের) কবুলিয়তের পরিবর্তে পরের (৩/৬/৫৩ তারিখের) কবুলিয়ত গ্রাহ্য করে আমাদের নামের রেকর্ড কর্তন করার আদেশ দিলেন। শোনা গেছে যে, খান সাহেবদের এই "আদেশ" খানার মূল্য নাকি চারশ টাকা।

উপরোক্ত ভূমি পুনরোদ্ধার কল্পে আমাদের মালিক পক্ষ হরেন্দ্র নাথ বক্সী গং ১৩৫৫ সালের কার্তিক মাসে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন (বরিশাল ১ম সাব জজ আদালত, মোং নং ১২৩/৪৯ এবং পরে কোর্ট ট্রান্সফার হয়ে ৩য় সাব জজ আদালত মোং নং ৬৭/৫৭)। দীর্ঘ ১৬ বছর মামলা পরিচালনা করে ৮৮ বছর বয়স্ক সুবৃদ্ধ হরেন্দ্র নাথ বক্সী ১৩৭১ সালের ২৯শে ফাল্গুন মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর বাদী পক্ষের অন্যান্য শরীকগণ মামলা আর পরিচালনায় অপারগ হয়ে ১৩৭৩ সালের ২২শে চৈত্র তারিখে মামলাটি তুলে আনেন। উক্ত ৫.৮৩ শতাংশ জমি আর পুনরোদ্ধার হয় নাই এর ফলে আমার বিক্রিত ২.৮৮ ও খান সাহেবদের ভাক্ত রেকর্ডীয় ৫.৮৩, একুনে ৮.৭১ শতাংশ জমি হস্তান্তরিত হয়ে যায়। সুতরাং আমার বর্তমানে স্বোপার্জিত ভূসম্পত্তির পরিমাণ হ'ল (২৩.৩০-৮.৭১) ১৪.৫৯ শতাংশ এবং পৈত্রিক সত্বের ১.৭৫ সহ মোট ১৬.৩৪ শতাংশ মাত্র।

AMARBOI.COM

দেশ সেবা

ভেকের কাছে "ডোবা"ই তার দেশ, কৃষকের 'দেশ' তার পল্লী, এবং রাষ্ট্র-নেতার কাছে "দেশ" তার তাঁর গোটা রাষ্ট্র। আমার "দেশ-সেবা" মানে 'রাষ্ট্র সেবা" নয়, পল্লী-সেবা।

এককালে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষই ছিল - ভবঘুরে, যাযাবর, পেশাদার শিকারী। সেই ভবঘুরে যাযাবরত্ব ঘুচিয়ে কৃষকরাই হল প্রথম গৃহবাসী। আর সেই গৃহের আসে পাশে ফল-ফসলাদি রোপীয়ে জীবিকা নির্বাহের পথ পেয়ে স্থানু হয়ে বসল তারা এক জায়গায় পুরুষানুক্রমে। সে যুগে এটা ছিল তাদের গৌরবের বিষয়। আর আজকালকার কৃষকরা শুধু স্থানু নয় কুনোও। এমন কি "কুনো বেঙ" বললেও সেটা দোষের হয় না। কেননা কৃষকরা কোন দেশ ভ্রমন করে না, এক জিলার কৃষক আর এক জিলায় বড় একটা যায় না। এমনকি কেহবা নিজ জেলার সদর পর্যন্ত চেনে না। প্রকৃত ফসলদরদী কৃষক পশু পাখীর অত্যাচারে ফসল নষ্ট হবার ভয়ে এবং গরু-বাছুর উপোষ রেখে দিনমানের জন্যও গ্রামান্তরে যায় না, অনেকে শশুরালয়ে বেড়ায় না। তাদের কাছে নিজ পল্লীই মাতৃভূমি, পল্লীই দেশ, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছেও তাই। আর তারই জন্য আমি আমার সামান্য শক্তিটুকু নিয়ে কৃষি-কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেশ-সেবার নামে কিছু কিছু পল্লী সেবার চেষ্টা করেছি।

কৃষক মাত্রেই জানেন যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে একক ভাবে কৃষি কাজ সম্পন্ন করা কতটুকু কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। আমার কৃষি কাজ আজীবন আমাকে একাই সম্পন্ন করতে হয়েছে। কেননা-আমাকে কৃষি কাজে কিছু মাত্র সাহায্য করতে পারে, এমন কোন লোক ছিল না আমার পরিবারের মধ্যে। ছেলেরা ছিল কেউ ছোট, কেউ বা স্কুলে পাঠ্যাবস্থায়ে। গ্রাম্য সালিশী বিচারের কাজ ছিল আমার দৈনন্দিন ব্যাপার। তদুপরি দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাধা করতে গিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে দিনের কাজগুলো রাতে করতে হয়েছে অনেক। তথাপি নিম্ন লিখিত পল্লী সেবার কাজ সমূহ সমাধা করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

খোরাক-পোসাক

১৩২০/২১ সালের কথা। বয়স আমার তখন ১৩-১৪ বছর। বাড়ীতে সোনার কর্মকার ছিলেন মধুসুধন ও তাঁর ছেলে রসিক চন্দ্র। রসিক সুর করে রামায়ন পড়ত, আমি পড়তে পারতাম না, তবে কাছে বসে মনোযোগ দিয়ে রাম-রাবণের কাহিনী শোনতাম। শোনতাম যে, রাবণ রাক্ষস জাতি, ওরা মানুষ ভক্ষন করে, রাবণের দশটি মাথা, বিশটি চক্ষু, বিশ খানা হাত ইত্যাদি। কোথায় লঙ্কা আর কোথায় রামেশ্বর এবং কোন যুগের কাহিনী কোন যুগে শোনা; সে সব হিসাব করতাম না, শুনে শুধু ভয় করত। কাহিনীটা কয়েক যুগের পুরোনো বা বাসি হলেও ভয়টা হত একদম তাজা। কল্পনার চক্ষে যেন দেখতাম রাবণকে, আর মনে হত সে যেন কাছে পেলে আমাকেও খাবে।

আবার ভাবতাম রাক্ষসরা মানুষ খায়। তাই তারা মানুষের কাছে রাক্ষস। কিন্তু মানুষেও ত গরু খায়, মোষ খায়, কোন কোন দেশে নাকি ঘোড়াও খায়। ওদের রক্ত, মাংস, ইত্যাদি মানুষের মতই এবং আকারেও শক্তিতে ওরা মানুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে এদের ভক্ষন করে "মানুষ রাক্ষস নয়" কেন? রাবণ তার জীবনে কয়টি মানুষ ভক্ষন করেছিল এবং কোন দেশের কাকে ভক্ষন করে ছিল, রামায়নে কবি তা একবারও বলেন নাই। পশু, পাখী, মৎস্য ভক্ষন করেও "মানুষ রাক্ষস নয়" কেন?

আমি মনে মনে "রাক্ষস" নামের একটা সংজ্ঞা দিলাম। রাক্ষসরা মানুষ ভক্ষন করে, তাই তারা মানুষের কাছে "রাক্ষস"। অনুরূপ- হরিণের কাছে বাঘ "রাক্ষস", ইদুঁরের কাছে বিড়াল "রাক্ষস", ব্যাঙের কাছে সাপ "রাক্ষস" এবং নানা জাতীয়- পশু, পাখী, মৎস্য ইত্যাদির কাছে মানুষও 'রাক্ষস"। অর্থাৎ জীবে জীব ভক্ষন করাটাই রাক্ষসীপনা। অধিকন্তু মানুষ যত রকম জীব ভক্ষন করে, অন্য কোন জীবই তত রকম জীব ভক্ষন করে না। সুতরাং মানুষই সবের চেয়ে বড় রাক্ষস। সিদ্ধান্ত করলাম- "আমি রাক্ষস হব না।"

মাছ-মাংসের প্রতি আমার লোভ ছিল না এর আগেও, ছিল ঘৃনা। কেননা তখন আমি মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতাম যে, শশা, পেপে, টম্যাটো ইত্যাদি লোকে রান্না না করে কাঁচাও খেয়ে থাকে। লাউ, কুমড়া, সীম, বরবটি ইত্যাদি তরকারী গুলো কাঁচাও ভক্ষণ করা যায়। কেননা উহা কাঁচা ভক্ষন করলে বা মুখে দিয়ে চিবুলে ঘৃনার উদ্রেক হয় না। কিন্তু এক টুকরা কাঁচা মাছ বা মাংস ঐ রূপ কেউ ভক্ষন বা চর্বন করতে পারে না, করতে গেলে তার বমন না হয়ে যায় না। কেননা কাঁচা মাছ বা মাংস একান্তই অখাদ্য, অত্যন্ত ঘৃনার বস্তু। মানুষ তার ঐ ঘৃনাটা দূর করার চেষ্টা করে মাছ-মাংস রান্না করে। হলুদ-মরিচ দিয়ে রং ও ঝাল করে, পেঁইজ-রোসনাদি দিয়ে দুর্গন্ধ নষ্ট করে, তৈল-লবণ দিয়ে স্বাদ বৃদ্ধি করে এবং তাপ দিয়ে কমল করে মাত্র। কিন্তু মূল বস্তুটি যা, তাই থেকে যায় নতুবা সাপ, কুঁচে, ইঁদুর-বাঁদর ও বিড়াল-কুকুরের মাংস রান্না করে খাওয়া হয় না কেন?

ঐ সমস্ত ভেবে ভেবে আমি আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করে নিরামিষ ভোজের সংকল্প করলাম এবং ধীরে ধীরে উহা কার্যকর করতে সচেষ্ট হলাম। কিন্তু মা-বোনের আদরের জ্বালায় সহসা আমিষ ছাড়তে পারলাম না। তবে পুরাপুরি নিরামিষ ভোজী হয়ে গেলাম আমি স্বয়ং সংসারী হবার পর (১৩২৯)।

১৩৫৫ সালের ভাদ্র মাসে চারু চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার" নামক পুস্তক খানা আমার হাতে এলো। ওতে দেখতে পেলাম যে, মানুষ, পশু, পাখী ইত্যাদির সহিত গাছ পালার জীবন ও জীবনানুভূতির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। এমন কি দৈহিক গঠনেও না। প্রাণীর বিশেষতঃ মানুষের ন্যায় উহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জড়া-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, বেদনার অনুভূতি আছে। এমন কি শ্রবনানুভূতিও আছে। তবে সে অনুভূতি ব্যক্ত নয়, অব্যক্ত। প্রাণীদের মতই- উহাদের হৃৎপিণ্ড, শ্বাস যন্ত্র, পাকযন্ত্র, পেশি, স্নায়ু ইত্যাদি সবই আছে। সুতরাং উদ্ভিদরাও প্রাণী মনে করা যেতে পারে যে, প্রাণীরা-সচল ও সবাক, উদ্ভিদরা অচল ও নির্বাক কিন্তু ইহাই বা সম্পূর্ণ সত্য কোথায়। মানুষ এক স্থানে বসে বা দাঁড়িয়ে শুধু হস্ত সঞ্চালন পূর্বক বহু কাজ সমাধা করে থাকে। তদ্রূপ পদ সঞ্চালন না করেও উদ্ভিদরা শুধু অঙ্গ চালনা দ্বারা অনেক আবশ্যকীয় কাজ সেরে নিয়ে থাকে। মূল এক জায়গায় ঠিক রেখেও উদ্ভিদ তার শাখা-প্রশাখা ও শিকড়-উপশিকড় গুলো এদিক সেদিক পাঠিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। এবং চলার পথে বাধা পেলে মানুষের মতই পথ বদলায়। উদ্ভিদেরও ভাষা আছে। উহা শাব্দিক নয়, ইঙ্গিত পূর্ণ এবং উহা বোঝবার মত আমাদের অনুভূতি নাই। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু উহা ক্রেস্কোগ্রাফ, রেজোনান্ট রেকর্ডার ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, উদ্ভিদের ভাষা আছে।

এ সমস্ত জেনে শুনে আমার এত দিনের পোষা ছেলে বেলার কল্পনার গায়ে আঘাত লাগল। "প্রাণ" থাকলেও "প্রাণীদের মত উদ্ভিদের অনুভূতি নাই", ইহাই ছিল আমার তখনকার ধারনা। তাই, নিঃসঙ্কোচে উদ্ভিদদের হত্যা করে নিরামিষ ভোজন করেছি এবং সহানুভূতি দেখিয়েছি প্রাণীদের। আর এখন দেখতে পাচ্ছি যে, আমিষ বা নিরামিষ-ভোজন, উভয়তঃই সমান জীব হত্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~